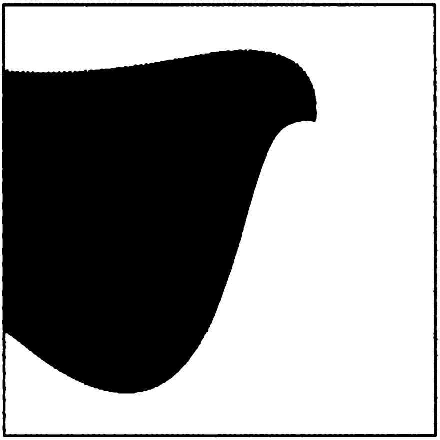
মুক্তিযুদ্ধের কথকতা

পান্না কায়সার





’৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে মা-বাবা আড়াই বছরের পুত্রসহ সীমান্ত পাড়ি দেবার জন্য এক বন্ধুর সাহায্যে গ্রামে এক মাঝির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সময়মতো যুদ্ধের এক রাতে নৌকায় চেপে সীমান্ত পার হবার জন্য রওনা হয়। কিন্তু হঠাৎ দমকা হাওয়া ও প্রচণ্ড ঢেউ-এ নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে বাবা-মা সন্তানসহ নৌকা থেকে পড়ে যায়। মাঝি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ঢেউ-এ মাঝি মা-বাবাকে খুঁজে পায়নি। অনেক কষ্টে ছেলেটিকে খুঁজে পেয়ে বাড়ি ফেরে মাঝি। তারপর কী হয় সে শিশুর জীবনে—এ কষ্টের কথকতা আছে *মুক্তিযুদ্ধের কথকতা* উপন্যাসে।

প্রচ্ছদ সব্যসাচী হাজরা

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৯/ ডিসেম্বর ২০১২

চারুলিপি প্রকাশন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে হুমায়ুন কবীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং মৌমিতা প্রিন্টার্স, ২৫ প্যারিদাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত। বর্নবিন্যাস : ঈশিন

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

দাম : ১৫০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN 978 984 598 075 3

Muktijudder Kothakota by Panna Kaisar
Published by Humayun Kabir
Charulipi Prokashon, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
First Edition : December 2012, Price Tk. 150.00 Only. $ 8.00
E-Mail : charulipi_prokashon@yahoo.com cell : 01715983899

U.K. Distributor	Sangeeta Limited, 23 Brick Lane, London
U.S.A. Distributor	Muktadhara, 37-69. 2nd floor, 74 St, Jackson Height, N.Y. 11372
Canada Distributor	Anyamela, 300 Danforth Ave. (1st floor, Suite-202), Toronto
	ATN Mega Store, 2970 Danforth Ave, Toronto

উৎসর্গ

শহীদুল্লা কায়সার
সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক

স্মৃতির উদ্দেশে

পরশ হাফাতে হাফাতে ঘরে ঢোকে। গলা ছেড়ে ডেকেও কোন সাড়া পায় না সে। কপালে হাত দিয়ে ঘরের দাওয়ায় বসে পড়ে। আবার ডাকে মা-বাবা তোমরা কোথায় গেলে। কি যে আনন্দের খবর তোমাদের জন্য এনেছি। কোথায় তোমরা? পরশ দাওয়ায় মন খারাপ করে বসেই থাকে। মনে মনে ভাবে "যাবো নাকি বড় ভাইয়ার কাছে?" নাহ্ মা-বাবাকে খবর না দিয়ে পরশ কোথাও যাবে না। চোখ মেলে তাকায় চারদিকে। উর্ধপানে মুখ তুলে তাকায় সীমাহীন নীল আকাশটার দিকে। বুক চিরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। মনে মনে বলে "ওহে আকাশ তোমার স্বচ্ছতায় আমাকে আলোর পথ দেখাও।" চোখ জোড়া ওর ঝাপসা হয়ে আসছে। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখে মা বাবা একেবারে উঠোনে। "সুখবর আছে" বলেই মা বাবাকে কদমবুচি করে জড়িয়ে ধরে পরশ। কী সুখবর রে? মা পরশের কাঁধে হাত রেখে বলে। "পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ বাবা?"

কী ফল করলি?

কোন রকমে পাশ? কী করবি বাবা তোকে আমি কোন আর্থিক সাহায্য করতে পারিনি। কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে রোদে বৃষ্টিতে স্কুলে গিয়েছিস। স্কুলের শিক্ষকরা তোকে অনেক সাহায্য করেছে জানি। কী করবি বাবা, তোর বাবা ছিল সাধারণ মাঝি। সবই তোর দেখা। এখন বয়স হয়েছে আর নৌকা চালাতে পারি না। পয়সা কড়ি যা ছিল তোর বড় ভাই অপুকে মুদি দোকান দিয়ে স্বাবলম্বি হবার চেষ্টা করছি। আর আমি? বাড়ির সামনে পান দোকান দিয়ে দুটো পয়সা রোজগারের চেষ্টা করছি। অপু মেট্রিক পাশ দিয়ে এখন মুদি দোকানদার। তোর পাশের খবর জেনে আমি খুশি হয়েছি।"

"আরে বাবা কী রেজাল্ট করলাম তাতো জানতে চাইলে না।" পরশ বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে "জি পি. এ পাঁচ পেয়েছি। মানে সব চেয়ে ভাল ফল।" পরশের কথা শুনে মাও ছেলেকে জড়িয়ে ধরে।

পরশের চোখের পাপড়ি ভিজে যায়। ঝাপসা স্মৃতি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাবা সবুর মাঝির চোখ এড়ায় না। পরশকে একেবারে বুকের মধ্যে চেপে ধরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে "এবার কী কররি ভেবেছিস? এ অর্জন তোর নিজের চেষ্টায়।"

"বাবা আমার পরীক্ষার যে ফল; আমি যে কোন ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারবো। আমার ইচ্ছে আমি ভাল কলেজে ভর্তি হবো। অনেক বড় হবো। তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবো বাবা।"

মাঝি সবুর মোল্লা ছেলের হাতটা ধরে বলল "ভাল কলেজে পড়তে যে বাবা অনেক খরচ। অপুকে কলেজে পড়াতে পারলাম না। ভাল কলেজে পড়তে যে অনেক খরচ। সে কী সম্ভব?"

পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। চেষ্টা থাকলে সব হয় বাবা। আমি যাই ভাইয়াকে খবরটা দিয়ে আসি।

"কিছু খেয়ে যা বাবা" মা পেছন থেকে ডাকে। "ফিরে এসে খাবো মা।"

পরশ ছুটে যায়।

সবুর মাঝি দাওয়ায় বসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলে "ছেলেটি কী ভাল ফলই করলো। ওর ভেতরে কী আগুন জ্বলে তা বুঝতে পারি। ঝাপসা স্মৃতি কী ভুলতে পেরেছে? সে জন্যই ভাল ফল করার জন্য কী আপ্রাণ চেষ্টা! এখন আমি কী করি অপুর মা বলতো? ভাল কলেজে পড়তে অনেক খরচ। আমার কী সে সামর্থ আছে?" "অপু রাতে ফিরুক। বাপ বেটা মিলে কী করবে ঠিক করবে। আমাদের তো নুন আনতে পান্তা ফুরায়।" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সবুরের স্ত্রী আমেনা বলে।

"ও কথা কেন বলছো? আমেনা। যখন নৌকার মাঝি ছিলাম। তখন তো অবস্থা আরো খারাপ ছিল। এখন অপু মুদি দোকান দিয়েছে আমি ঘাটের কাছে পান দোকান দিয়েছি। দুজনের আয়ে খেয়ে পরে তো বাঁচতে পারছি দুঃখ শুধু অপুকে মেট্রিক পাশের পর পড়াতে পারলাম না, পরশের কথা আলাদা। এতো ভাল ফল করার পর যদি ওকে কলেজে পড়াতে না পারি ওকে কী জবাব দেবো।

"দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে এখন এসে দুটো খাওতো। আমাদের সাধ্য সামর্থ্যের মধ্যে যা করার তাই করবো। এতো ভাবনা কিসের? মাত্র তো আজই ফল বের হলো।" কথাগুলো বলে আমেনা সবুরের খাবারের ব্যবস্থা করতে রান্না ঘরে চলে যায়।

সবুর দাওয়ায় বসে পরশের কথাই ভাবছে। পরশ মাইলের পর মাইল হেঁটে রোদ বৃষ্টিতে স্কুলে গেছে। শিক্ষকদের সহায়তা পেয়েছে অনেক। ওর জন্য কোন প্রাইভেট মাস্টারও রাখতে পারেনি সবুর। শুধু নিজ চেষ্টায় এতো ভাল ফল করে ও কলেজে পড়তে পারবে না। সবুরের জন্য যে এর ভার বহন করা কঠিন। পরম আদরে বুক আগলে মানুষ করেছে সবুর। কত কথা কত স্মৃতি সবুরের চোখের সামনে ভেসে উঠে।

"কৈ খেতে আসুন। আমার হাতে অনেক কাজ। আসুন তো খেয়ে যান"। আমেনা আবার ডাকে। সবুর ধীর পারে রশুই ঘরে একটা পিঁড়ি পেতে বসে। বড়ই আনমনা মনে হচ্ছে তাকে। আমেনা বুঝতে পারে। ভাত বাড়তে বাড়তে সবুরের দিকে তাকায়। বড্ডই চিন্তা ক্লিষ্ট মনে হচ্ছে সবুরকে। আমেনা সব বুঝতে পারে। পরশকে তো আমেনাও বুক আগলে মানুষ করেছে। সেই ছোটবেলা থেকে পরশের গলায় সোনার চেইনে ছোট গিনি আজও সে রকমই আছে। আমেনা ভয়ে ভয়ে বলে

"পরশ বাবার যখন কলেজে পড়ার ইচ্ছে; আপাততঃ চেইন ও গিনিটা বিক্রি করে ওর ভাল কলেজে পড়ালেখার কাজটা শুরু করা যায় না?" কী বললে আমেনা? মুখে আটকালো না এ কথা বলতে? ও চেইন আর গিনি ওর জীবনের কতটা জুড়ে তুমি কী জান না? এমন অলুক্ষণে কথা আর যেন না শুনি।" সবুর রাগে ফেটে পড়ে। আমেনা থতমত খেয়ে বলে "আমি জানি সবই। কী করবো উপায় না দেখে বলে ফেললাম।" আমেনা ভয়ে ভয়ে সবুরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"এ চেইন আর গিনি পরশের জীবনে সবটুকু জুড়ে। আমি কী বুঝি না? আপনি শান্ত হউন। আমরা বেঁচে থাকতে পরশের একটা উপায় হবেই। বুক আগলে বড় করতে পারলে কলেজে-ও-পড়াতে পারবো। পরশের সামনে অভাব অনটনের দোহাই না দিয়ে ওকে সাহস দেয়াই এখন আমাদের বড় কাজ।"

সবুর খাওয়া শেষ করে কোন কথা না বলে হন হন করে বেরিয়ে যায়। "কোথায় যাচ্ছেন? পানের খিলিটা মুখে দিয়ে যান।"

আমেনা দাওয়ায় পানের খিলিটা হাতে নিয়েই আনমনা হয়ে রশুই ঘরের দাওয়ায় বসে পড়ে। দীর্ঘ বছরের স্মৃতি গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে চোখের উপর। স্পষ্ট জ্বলজ্বলে হয়ে উঠে স্মৃতিগুলো। চাঁদের মতো মুখখানা আমেনার বুক ভরিয়ে দিয়েছিল। কী বা তখন আমেনার বয়স। সে-ই পরশ আজ কত বড় হয়েছে। আমেনা বুক ছেড়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলে পরশ আরো বড় হবে। অনেক বড়। কোন দিন যেন পরশকে হারাতে না হয়। আমেনা দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠে। পরশকে বুকে আগলে কী সুখ-ই-না পেয়েছিল। এসব ভাবতে ভাবতে বিকেল গড়িয়ে আসে। আমেনা তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়ায়। বিকেলের রান্না সারতে হবে। হাঁস মুরগি খোঁয়াড়ে নিতে হবে। উঃ কত কাজ। হিমশিম খায় আমেনা। দ্রুত কাজে হাত লাগায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরশ ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। পরশের বয়স তখন আড়াই বছর। ঘরের দাওয়ায় বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে শুধুই কান্না কাটি। "আমি এ নিঝুম গ্রামে থাকব না। আমার এখানে ভাল লাগে না। তোমরা আমাকে নদীতে ডুবিয়ে দাও। আমি নদীতেই ডুবিয়ে মরি।" আমেনা—সবুর মাঝি বুকের সবটুকু উত্তাপ দিয়ে পরশকে সান্ত্বনা দেয়। বুকে চেপে ধরে আদর করে। তবু ও-পরশের মন মানে না। বায়না ধরে বসে সবুরের কাছে "তোমার সঙ্গে নৌকায় বেড়াতে যাবো।" সবুরের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠে যদি নৌকা থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে বসে? তখন কী করবে সবুর? সবুর সান্ত্বনা দিয়ে বলে আরে ব্যাটা। নৌকায় কত যাত্রী থাকে। এমনিতেই জায়গা হয় না। "ভাবিস না সময় বুঝে তোকে একদিন নিয়ে যাবো।" "নদীর গভীরে কী ওরা লুকিয়ে আছে?" কী অর্থহীন প্রশ্ন পরশের। আরে বোকা ছেলে নদীর স্রোত কোথায় কাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কে জানে? সবুর পরশকে সান্ত্বনা দিয়ে বুক আগলে বলে "তোকে এ গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবো। অপুর সঙ্গে স্কুলে যাবি আসবি। পড়ালেখা করে অনেক বড় হবি। তখন নদীতে নয় এদেশের মাটিতেই সব খুঁজে পাবি। আগে পড়ালেখা-তারপর অন্য সব। আমি তোর মা তো আছি তোর পাশে। এরকম নানা কথা নানা স্মৃতি আমেনাকে কেন আজ এতো অস্থির করে তুলছে? আমেনা নিজের কাছে প্রশ্ন করেও উত্তর খুঁজে পায় না।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। এখনও বাপবেটাদের ঘরে ফেরার নাম গন্ধ নেই। এরকম তো প্রায়-ই হয়। তবে আজ কেন এতো অস্থিরতা? আমেনা এক সময় ঘুমিয়েই পড়ে। বাপবেটারা হৈ হুল্লোড় করে ফিরতেই আমেনা ধড়ফড়িয়ে ঘরের বাইরে হ্যারিক্যানটা নিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না তবুও পরশের মুখখানা পরখ করে দেখতে চেষ্টা করে। কিছু দেখা বা বোঝার আগেই বাপ বেটারা হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকেই পরশ আমেনাকে জড়িয়ে ধরে "মা ক্ষিধা পেয়েছে। ভাল কিছু রান্না করেছো তো? আমি কিন্তু পরীক্ষায় ভাল করেছি।"

"মা পরশ কী ভাল ফলটাই না করলো।" পরশের কাঁধে হাত রেখে অপু বলে।

আল্লাহ মুখ তুলে চেয়েছেন, "আমেনার উত্তরে অপু অভিমানের সুরে বলে "আল্লাহ মুখ তুলে চেয়েছেন সত্যি। কিন্তু পরশের চেষ্টা? কষ্ট?" আমেনা পরশকে বুকে জড়িয়ে ধরে "তুই অনেক বড় হবি দেখে নিস" ঝাপসা স্মৃতিতে পরশের বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠে। চোখের পাপড়ি ভিজে যায়। নিজেকে সামলে নেয় তড়িৎ। খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই বসে খাটের উপর। পানের খিলি বানাতে বানাতে "বাপ বেটারা মিলে কিছু বলবে মনে হয়।" সবুর পরশের হাতটা নিজের হাতে তুলে বলে "কালই পরশকে নিয়ে ঢাকায় যাবো। পরশের ইচ্ছে ঢাকা কলেজে পড়বে। ঘুরে দেখে আসি খরচ টরচ কী হতে পারে। অপুর ও তাই ইচ্ছে। আমাদের যা রোজগার পেরে উঠতে পারবো কিনা জানি না।"

"এতো ভাল ফল করে পরশকে আমার সঙ্গে মুদি দোকানে বসতে দেব না। আমি তো টেনে টুনে মেট্রিকটা পাশ করেছি। কী বলিস পরশ।" অপু কথা গুলো বলতে বলতে পরশকে জড়িয়ে ধরে।

পরশের ভেতরটা রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে নেচে উঠে। নিজকে সামলে পরশ অপুকে জড়িয়ে ধরে বলে, "ভেবনা ভাইয়া লেখাপড়া করে বড় চাকরি করবো। আমাদের দিন বদলের পালা শেষ হবে। ঢাকাতেই তোমাকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী করে ছাড়ব না "কিন্তু বাছাধন এখন আমাদের স্বল্প আয়ে ... আমেনার কথা শেষ হতে দেয় না পরশ—বলে "মা অঙ্কে এবং বিজ্ঞানে বরাবরই সর্ব্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছি। ভর্তি হবার পর আমি টিউশনি করবো। কলেজে সরকার থেকে যে কম্পিউটারটা পেয়েছি। কম্পিউটারে সারা স্কুলে আমি একমাত্র পারদর্শী। স্যাররা আমাকে নিয়ে অনেক আশাবাদী। দ্যাখো মা কলেজে ও আমি সেরা ছাত্র হতে পারবো। তুমি শুধু আশীর্বাদ করো।"

"আচ্ছা বাবা পরশ তো ঢাকা শহরে যায়নি কখনও। তুমি গেছো ২/৩ বার রমিজ চাচার বাসায়। তা তোমরা কী রমিজ চাচার কাছেই যাবে। রমিজ চাচার দু ছেলে নাকি স্কুলে ৭ম - ৯ম শ্রেণীতে পড়ে। ঢাকা কলেজ খুঁজে পাবে তো?" অপুর কথায় সবুর এক গাল হেসে বলে রমিজ আমার জন্য সব করবে। আমরা দু ভাই পিঠাপিঠি বড় হয়েছি। একদিন না বলে মুক্তিযুদ্ধে চলে গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে গ্রামে নিজের নৌকাটা বিক্রি করে চলে গেল ঢাকায়। সেখানে নাকি দেশ গড়ার অনেক দায়িত্ব। সে-ই যে ঢাকা গেল আর ফেরা হলো না। শুনেছি এখন যুব লীগের সঙ্গে কাজ করছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর গা ঢাকা দিয়েছিল অনেক দিন। খুব বুদ্ধিমান

ছেলে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বছর কয়েক পরে নিজের প্রভাব ও বুদ্ধি খাটিয়ে কাওরান বাজারে কাঠের দোকান খুলে কাঠের ব্যবসা শুরু। বিয়েও করেছে অনেক দেরীতে। ব্যবসা দাঁড় করিয়ে কাঠ ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করে সুখেই আছে। কাওরান বাজারে-ই বাসা। তিন সন্তানের জনক রমিজ সুখেই আছে। আর আমি গ্রামে পড়ে থেকে এখনও জীবন যুদ্ধ। যাক গে। রমিজের কাছেই যাবো।

"ওরা তো কতদিন হলো বাড়ি আসে না।" আমেনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে।

"কেন গেল বছরেই তো শীতে এসে গেল। ঢাকায়—আমার ভাই কত ব্যস্ত।" সবুর সহানুভূতির সঙ্গে কথাটা বলে, পানের আরেকটা খিলি মুখে দিয়ে পরশের দিকে তাকিয়ে বলে পরশ সকালেই আমরা রওনা দেবো। রমিজের দু ছেলে আছে ওরাই আমাদের সব রকমের সাহায্য করবে। মেয়েটি তো এখনও ছোট। যাক এক ফাঁকে অনেক দিন পর ওদের সঙ্গে দেখা হবে। আচ্ছা অপুর মা ঘরে কিছু আছে ওদের জন্য নেয়া যায়? ঘরে নারকেল মুড়ি চিড়া আছে। বস্তা ভরে দিয়ে দেবো। সঙ্গে চালের গুড়ো।"

এ তাতেই চলবে।"

রাত অনেক হলো। যে যার মতো শুতে গেল। কিন্তু ঘুম আসে না পরশের চোখে। আনন্দে উদ্বেলিত পরশ। ওর লালিত স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। ওর ভেতরে জমানো ঝাপসা স্মৃতি বার বার ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট স্মৃতিতে পরশ ঘর্মাক্ত হচ্ছে। অস্পষ্ট স্মৃতিগুলো যখনই ধোঁয়াটে হয়ে যায় তখনই চোখ দুটো পানিতে গড়িয়ে পড়ে। পরশ এপাশ ওপাশ করে আর ভাবে জীবনটা আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আবার ভাবে নাহ্ ভাবনা কেন? এ জীবন তো আমাকে পরীক্ষায় ভাল ফল দিয়েছে। ঢাকায় যাবার সুযোগ হয়েছে। ঢাকা কলেজে নির্ঘাত ভর্তি। জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশে তারাদের মেলা। পরশ সন্তর্পণে জানালার পাশে দাঁড়ায়। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে—মনের অজান্তেই বিড়বিড় করে বলে উঠলো—

> থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
> ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
> নিঠুর নিবিড় বন্ধন সুখে হৃদয় নাচে;
> ত্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার ব্যাকুলিয়াছে
> বুকের কাছে

পরশ যত বড় হচ্ছিল ঝাপসা স্মৃতিগুলো ভুলে থাকার জন্য বই, শুধু বই-ই ছিল নিত্যসঙ্গী। পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও পড়েছে রবীন্দ্র, নজরুল, সহ স্বনাম ধন্য লেখকদের সাহিত্য। অন্ততঃ মনো জগতের চেপে রাখা কষ্টটা ভুলে থাকার চেষ্টা মাত্র। পরিবর্তে পরশ পেয়েছে পরিশীলিত মনে পড়েছে আলোর ছাপ। এ পাড়া গাঁয়েই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হয়ে বেড়ে উঠেছে। এ গ্রামের সকলের প্রিয় ভাজন হয়ে উঠতে পেরেছে। পেরেছে স্কুলের শিক্ষকদের কাছেও। বড় হতে হতে পরশের ভেতরে যে প্রত্যয় তাড়া করেছে। তা হলো অনাবিষ্কৃত সত্যকে আবিষ্কার করে সত্যকে সবার কাছে উম্মোচিত করা। পরশ জানালার গ্রিল ধরে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে এ জগৎ সংসারে কেউ কী জানে কী ঝাপসা স্মৃতি আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। এখনও স্পষ্ট হলো না আমার ঝাপসা স্মৃতি? কিসের স্মৃতি, কে

আছে আমার দ্বিধাকে স্পষ্ট করে দেয়। উপায় একটি উচ্চ শিক্ষায় পাঠ নিয়ে আলোকিত মানুষ হয়ে অন্ধকার ঠেলে আলোর সন্ধান পাওয়া। শিশু ভোলানাথের ক'টি লাইন পরশের মনে পড়ে যায়। চোখের জলে ভিজতে ভিজতে মনে মনে আওড়ায়।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে—
মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে ॥

অপু ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে পাশে পরশকে দেখতে না পেরে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে। দেখতে পায় পরশ জানালার গ্রিল ধরে বিড়বিড় করে কি সব বলছে। "কিরে পরশ এ মধ্য রাতে তোকে কী ভুতে পেয়েছে? কী অসব বিড়বিড় করে বলছিস? ঢাকা যাবার আনন্দ প্রকাশ হচ্ছে বুঝি? আয় ঘুমিয়ে পড়। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। ঢাকায় যেতে হবে না? আনন্দের ঝোলাটা পকেটে রেখে দে পরে আনন্দ প্রকাশের প্রচুর সময় পাবি। আয় আয় শুয়ে পড় তো।"

পরশ লজ্জা পায় মনে মনে। "টেনসনে ঘুম আসছে নারে।" "চোখ বন্ধ করে বালিশে মাথা রাখ ঘুম দেবতা নেমে আসবে। দয়া করে আমাকেও ঘুমাতে দেতো।" পরশ কোন কথা না বলে শুয়ে পড়ে।

বড় একটা বস্তা ভর্তি নারকেল, চিড়া, মুড়ি, চালের গুড়ো, মুড়ির মোয়া। সবুর ও পরশ দুজনে ধরাধরি করে বাসে উঠে। "আমি জানালার কাছে বসি?" হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। দুজনে বাসের সিটে বসে। সঙ্গে বড় বস্তাটা। বাসের হেলপার এসে বললো "বস্তাটা বাসের ছাদে রাখতে হবে।" "দেখো বাবা আবার এটি বেহাত হয়ে যাবে না তো?" কেন? কিছু হবে না। দেখতে পারছেন না সবার মালামাল বাসের ছাদেই উঠানো। আপনি আরাম করে বসুন এবং নিশ্চিন্তে থাকুন।"

বাস ঢাকার দিকে ছুটে চলছে। পরশের মন আনন্দ বেদনায় বার বার দোল খাচ্ছে। ও প্রথম ঢাকা শহর দু চোখ ভরে দেখবে। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী। অস্ফুট স্বরে বলে উঠে "হায়রে স্বাধীনতা।" "কিছু বলছিস বাবা?" সবুর পরশের কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করে।

"নাহ্ বাবা কিছু না।" কিন্তু পরশের ভেতরে কী ঝড় বয়ে চলছে সবুর জানে না। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকায় পরশ। প্রকৃতির কী লীলা বৈচিত্র্য! সবুজ প্রান্তর। রাস্তার দুধারে বড় ছোট সবুজ পত্র পল্লবে সাজানো গাছের সারি। বুড়িগঙ্গা সেতু, মেঘনা সেতু দিয়ে বাস ছুটে চলার সময় ওর মনটা আনন্দে নেচে উঠেছে। উচ্ছ্বাসে বলে উঠে—"আমার সোনার বাংলা।" কথাটা সবুরের কানে আসতেই সবুর ও বলে "হ্যাঁ বাবা সোনার বাংলাই তো। দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য কত লোক

বুকের রক্ত দিয়েছে। কত লোক অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে রে বাবা। তাদের জন্যই এ স্বাধীন বাংলাদেশ।" সবুর আর কথা বাড়াতে চাইলো না। ফস করে যদি কোন প্রশ্ন করে বসে। অন্য প্রসঙ্গে কথা বলে সবুর। "তোর কী স্থির বিশ্বাস ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে পারবি?" "হ্যাঁ বাবা" পরশের দৃঢ় উত্তর। "আমার যা আয় তুই তো সবই জানিস। মাসে কত টাকা লাগবে ধারনা করতে পারবি।" "সে তুমি ভেবো না বাবা। আমি টিউশনি করবো। তুমি যা পার তাই দিও। সিঁড়ি বেয়ে আমাকে উপরে উঠতেই হবে বাবা। শুধু দোয়া করো। তোমাদের সব অভাব অনটন আমি ঘুচিয়ে দেবো বাবা। এ বিশ্বাস রাখো আমার প্রতি।" আনন্দে পরশকে জড়িয়ে ধরে সবুর। দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এস নিজের অজান্তেই। স্মৃতিগুলো জ্বলজ্বল করে সবুরের সামনে আসে দাঁড়ায়। ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠে। পরশের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে সবুর। পরশ চমকে তাকায় সবুরের দিকে। "একি বাবা তোমার চোখে পানি?" সবুর অন্য প্রসঙ্গ টেনে বলে ভাবছিলাম একটু একটু করে তুই কত বড় হয়েছিস। পড়তে যাচ্ছিস বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে। স্বাধীন বাংলার রাজধানী শহরটা জয় করে ফিরবি।" বুক চিরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে সবুরের পরশ টের পায়। কিছু বলে না। উদাস দৃষ্টি মেলে বাইরে তাকায়। উপরে নীলাভ আকাশ, চারপাশে সবুজ ক্ষেত্র, গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে পরশ মনে মনে আওড়ায়—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল,
সত্তার নুতন আবির্ভাবে—
কে তুমি
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি?
পেল না উত্তর।

পরশ আকাশের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকে। মনে মনে বলে আমার কোন উত্তর-ই-কী মিলবে না? মাঝে মাঝে সবুরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু পারেনি। পাছে সবুর কষ্ট পাবে এ ভেবে করতে পারিনি। জীবন যেভাবে চলছে চলুক না। মেধাবী ছাত্র পরশ বই এর মধ্যে ডুবে থেকেছে। স্কুল ছুটির পর স্কুল লাইব্রেরিতে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরতো। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সবুর বা অপুকে কোন কাজে সাহায্য করতে পারেনি। এ নিয়ে সবুর বা অপুর কোন অভিযোগ ছিল না। বই পোকা পরশ বই এর জগতেই ডুবে থাক। এটুকু বিশাল অবদান না থাকলে পরশ এতো ভাল ফল করতে পারত না। নানা ভাবনায় পরশের ভেতরটা তোলপাড় হয়। ওর সামনে এখন দুর্গম পথ। দুর্গম পথকে পাড়ি দেবার জন্য চাই মানসিক শক্তি। পথ শেষ হয় না। "বাবা ঢাকা পৌঁছতে আর কত দেরী?" "এই তো এসে গেলাম।

কাঁচপুর ব্রিজ পার হচ্ছি। তারপর শনির আখড়া হয়ে সায়দাবাদ।"

এতো মানুষ! এতো যানজট! সায়দাবাদ আসতে আসতে রাস্তার যানজট! শুধু বাসের পেছনে বাস, ট্রাক, প্রাইভেট গাড়ি সি.এন.জি রিক্সা! আর চারপাশে অসংখ্য মানুষ! একি ঢাকা শহরের ছবি? বাসে বসেই পরশের এসব ভাবনায় দম আটকে যাচ্ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী শহরের একি হাল? মনটা খারাপ হয়ে যায় পরশের।

"এ-ই পরশ আমরা এসে গেছি। চল নেমে পড়ি।"

"এ জায়গাটার নাম কী বাবা?"

"সায়দাবাদ"।

"তবে কাওরান বাজার যাবো না?"

"যাবি। যাবি। আগে বাস থেকে নামি। বাসের ছাদে রাখা বস্তাটা নামাতে হবে। তারপর আরেকটা বাসে উঠব। সে বাস মগবাজার থামবে। মগবাজার থেকে রিক্সা নিয়ে সোজা কাওরান বাজার রমিজের দোকানে। জলদি নেমে পড়তো।" সায়দাবাদ থেকে মগবাজার পর্যন্ত যেতে পরশের মনটা আরো খারাপ হয়ে যায়। এতো যানজট! উঃ ঢাকা শহর তো দম আটকানোর অবস্থা। ছিমছাম গ্রাম তার চেয়ে অনেক ভাল। ঢাকা শহরে রাস্তায় মানুষ ছুটছে ছুটছে। রবোটের মতো। বাস রিক্সা সি.এন.জি রিকসাও চলছে উর্ধ্বশ্বাসে। এখানে যেন কারোর জন্য কারো সময় নেই। পরশ ভাবে "কীভাবে থাকবো এ শহরে!" বিষণ্ন হয়ে যায় পরশের মনটা। মনকে শক্ত করে পরশ। যে করেই হউক ঢাকা শহরকে জয় করবেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "যদি তোর সঙ্গে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।" এ রকম নানা ভাবনায় তোলপাড় হতে হতে বাস এনে থামে মগবাজার মোড়ে। বাপ ব্যাটা বাস থেকে নেমে একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়ে।

"কই যাইবেন?" রিক্সাওয়ালা জানতে চায়। "কাওরান বাজারে কাঠের দোকান গুলো আছে না? ওখানে যাবো।" রাস্তা মোটামোটি খালি-ই ছিল। মগবাজার মোড় থেকে কাওরান বাজারের কাঠের আড়তে এসে সবুর তালগোল পাকিয়ে ফেলে। কত পরিবর্তন হয়ে গেছে এক বছরে? রমিজ কাঠ এন্টারপ্রাইজ দোকানটা তো চোখে পড়ছে না। "পরশ তুই রিক্সায় বস তো। আমি দোকানটা খুঁজে আসি।" সবুর আশেপাশে কাঠের দোকানদারদের একে একে জিজ্ঞেস করতে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। দোকানের সামনে এসেই সবুরের চোখ ছানাবড়া!! ওরে বাপরে রমিজ-যে— দোকানটাকে আরো বড় করেছে। সাজিয়েছে খুব সুন্দর। কর্মচারীও বাড়িয়েছে। সবুর সোজা দোকানে ঢুকে এক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে "দোকানের মালিক কই?" আপনার বুঝি মাল লাগবে? তা বলুন কোন ধরনের কাঠ চাই।" "আরে বাবা আমি আগে মালিকের সঙ্গে দেখা করবো। কোথায় উনি?"

"আছে উনি। ভেতরের রুমে।" কর্মচারী আঙ্গুল উঁচিয়ে ভেতরের রুমটা দেখিয়ে দেয়।

সবুর সোজা ঢুকে যায় সে রুমে।

রমিজ সবুরকে দেখে উঠে দাঁড়ায় চিৎকার করে বলে—

"আরে ভাইজান? কতদিন পর এলে বলতো। উঃ আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে। বুকে জড়িয়ে রমিজ সবুরকে। ওদের দু ভাইয়ের আনন্দ প্রকাশ শেষ হয় না।

এদিকে পরশের অস্থির সময় কাটছে। "বাবার ফিরতে এতো দেরী কেন? চাচার দোকানটা খুঁজে পেতে এতো দেরী হচ্ছে কেন? কী জানি চাচা যদি কাওরান বাজার ছেড়ে অন্য জায়গায় দোকান পরিবর্তন করে চলে যায়? চাচা ব্যবসায় ভাল করছে এ কথা গ্রামের সবার মুখে মুখে। পরশের অস্থিরতা বেড়েই চলে।

"বসো ভাইজান বসো। কী খাবে বলো। কত দূর থেকে এসেছো। নিশ্চয়ই ক্লান্ত।"

"রিক্সায় পরশ বসে আছে মালামাল নিয়ে। ওকে আগে নিয়ে আসি। তোর দোকানটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো। তাই ওকে বসিয়ে আশেপাশের দোকানদার কে জিজ্ঞেস করতে করতে শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম। তুই দোকান বদলে বড় জায়গায় দোকান নিয়েছিস তা তো জানি না তুই বস। আমি পরশকে নিয়ে রিক্সাটা এখানে নিয়ে আসছি।" সবুর বেরিয়ে যায়। পিছু পিছু রমিজও। পরশ এসেছে। ঢাকা শহরে এ প্রথম আসা। পরশের প্রতি বরাবরই অন্যরকম টান। পরশের দিকে তাকালেই বুকটা চৌচির হয়ে যায়। ইচ্ছে হয় পরশকে বুকে চেপে ধরে উজাড় করে না বলা কথাগুলো বলুক। রমিজ তা কোন দিনও পারেনি।

"আরে পরশ? আয় আয়। কী যে আনন্দ। তুই এসেছিস এ রাজধানী ঢাকা শহরে। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীতে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।"

রমিজ পরশের হাতটা ধরে রিক্সা থেকে নামতে সাহায্য করেই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। "কত বড় হয়ে গিয়েছিস তুই" পরশ ঝুঁকে রমিজের পা ছুঁয়ে কদমবুচি করে। পরশের হাত ধরে দোকানের দিকে পা বাড়ায়। সবুর রিক্সা নিয়ে দোকানের দিকে এগোয়।

"তা পরশ কেমন লাগছে ঢাকা শহর?" রমিজ অতি আদরের সঙ্গে শুধায়।

"খুব ভাল লাগছে। বিশ্বাস হচ্ছে না আমি এ ঢাকা শহরে আসতে পারবো। বাবার উৎসাহ না পেলে এ আসা হতো না।" কথা বলতে বলতে ওরা দোকানে এসে পৌঁছায়। "ওরে বাবা চাচা আপনি তো বড় দোকান খুলে বসেছেন। "রনি, রবি কী সময় দিতে পারে আপনাকে?"

"আরে আমার দু পুত্রধনকে পড়ালেখায় উৎসাহ দিচ্ছি। এ বয়সে একবার টাকার গন্ধ পেলে আর পড়ালেখা করবে না। রনি ক্লাস টেন-এ, রবি ক্লাস এইটে। ভাল স্কুলে পড়ছে ওরা। আমি চাই ওরা পড়ালেখা করুক। দেশ সম্পর্কে জানুক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বড় হউক। দেশ এবং সমাজ সচেতন মানুষ হয়ে সততার সঙ্গে বড় হউক। তোর কথাও ভাবি আমি। যদিও গ্রামে বড় হয়েছিস, আমার ভাই তোকে ভাল স্কুলে ভর্তি করেছে। আমার ভাই সৎ মানুষ। একজন সৎ মানুষের সাহায্যে তুই বড় হয়েছিস। আমি ঢাকা থাকলেও তোর অপুর সব খবর রাখি। অপু তার ব্যবসায় ভাল করছে। গ্রামের মানুষের দুর্দিনে পাশে দাঁড়ায় অপু। দেখতে হবে না? অপু মুক্তিযোদ্ধার ছেলে—মুক্তিযোদ্ধার ভাতিজা।" "আমি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান নই?" পরশ হাসতে হাসতে বলে।

"মুক্তি সন্তান হিসেবে তোকে নিয়ে আমাদের গর্ব রে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ তোর রক্তের কণিকায়। যত বড় হবি ততো আরো জানবি। সে জন্য পড়তে হবে যুদ্ধের ইতিহাস। তুই তো বই পোকা আমি জানি ইতিহাস তুই জানবি।"

পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য কর্মচারীদের ডাক দেয়—"আমার ভাই ভাতিজা এসেছে। যাও ভাল নাস্তা নিয়ে এসো।"

ওরা তিনজনে চেয়ার টেনে বসে। গ্রামের খবরাখবর সম্পর্কে রমিজ জানতে চায়। পরশ যে পরীক্ষায় জি.পি.এ পাঁচ পেয়েছে রমিজ শুনে খুশিতে পরশকে জড়িয়ে ধরে। "আগে জানাসনি কেন?"

সবুর হাসতে হাসতে বলে "তোকে সামনাসামনি এসেই খবরটা দেবো সে জন্য বলিনি।

সাংঘাতিক ফল করেছিস তো পরশ? কী চাস বল।"

"আপনার দোয়া আর পরামর্শ।"

"দোয়া তো সব সময়ই আছে। আর পরামর্শ? সব হবে সব হবে। আগে কিছু খেয়ে নে। ভাইজান খাও তো। এ ফাঁকে দোকানের হিসেবটা করে ফেলি। এক সঙ্গে বাসায় ফিরবো। দাঁড়া রনি ও রবিকে ফোনে জানিয়ে দেই। মাকে বলুক ভাল মন্দ রান্না করতে। পরশ ব্যাটা এসেছে শুনলে তো ওরা খুশিতে লাফিয়ে উঠবে।"

"আচ্ছা চাচা রুহিনের কথা তো কিছুই বললেন না। ও কেমন আছে? নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়ে গেছে? ও কী সে পড়ে সে?"

"ও? আমার আদূরে কন্যা রুহিন বেশ বড় হয়ে গেছে। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। খুব দুষ্ট হয়েছে। তোমার মত বই পোকা হয়েছে। বই মেলায় যাবে আর গাদা গাদা বই কিনবে। তোমাকে দেখলে খুশিতে লাফাবে। শেষ বার যখন সবাইকে নিয়ে গ্রামে গেলাম কত ছোট ছিল সে। এখন যত বড় হচ্ছে এতো চঞ্চল হচ্ছে। বাসায় গেলেই দেখতে পাবে।"

রমিজ কথা গুলো বলে ক্যাশের হিসেবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আজ বাড়ি ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। অন্যদিন ফিরতে রাত হয়। আজ ভাই-ভাইপোর জন্য তাড়াতাড়িই ফিরবে। পরশ দোকান থেকে বেরিয়ে ঘুরে দেখে। সারি সারি দোকান, মানুষ আর মানুষ। রিক্সা ভ্যানের ভিড় রাস্তা জুড়ে। পরশের খুব ভাল লাগে। চারদিকে আলো আর আলো। ঢাকা শহরের আলোকে জয় করতেই হবে। জয় করতে হবে আরো অনেক কিছুকে। পরশের মনটা শক্ত প্রত্যয়ে নড়ে। পরশ নিজে নিজেই হেসে উঠে। মনে মনে বলে—

"যদি তোর সঙ্গে কেউ না আসে
তবে একলা চলোরে ॥"

পরশ ভাবে ধ্যাৎ কী সব ছাই ভস্ম ভাবছি। আমার পাশে তো আছে বাবা, চাচা, অপু রনি, রবি। আর কী চাই। আগে আসল উদ্দেশ্যটা সফল হউক। পরশ ওদিক সেদিক ঘুরে আবার দোকানে ফিরে আসে।

"কী চাচা শেষ হলো আপনার কাজ।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ শেষ হয়েছে। এবার চল বাসায় যাই। রনি তো দুবার ফোন ও করে ফেলেছে। বাসায় সবাই অপেক্ষা করছে। চল বের হই।"

দোকানের কর্মচারীকে বলে দুটো সি.এন.জি ডেকে আনতে। মালামাল নিয়ে আরাম করে যাওয়া যাবে। যথা সময়ে সি.এন.জি নিয়ে আসে কর্মচারী। সবুর রমিজ পরশ সি.এন.জি উঠে বসে। সঙ্গে গ্রাম থেকে আনা মালামাল।

ওরা ঘরে ঢুকতেই হৈ চৈ কাণ্ড। রনি বুকে চেপে ধরে পরশকে। কী হলো ভাইয়া? পরশ ভাইকে কী তুমিই আটকে রাখবে? পরশ নিজেই এগিয়ে এসে রবিকে বুকে টেনে নেয়।

"কত দিন পর দেখা। কী বড়ই না হয়ে গেছিস।"

"তুমি ও পরশ ভাই। কী ফলটাই না করলে। আমরা পারবো না তোমার মত এমন ফল করতে।"

"পারবি, পারবি। চেষ্টা করলে সব পারা যায়।" পরশ এগিয়ে এসে চাচীকে পা ছুঁয়ে সালাম করে।

"কেমন আছেন চাচী?"

বিনম্র ভদ্র পরশের কথায় মনটা জুড়িয়ে যায় রমিজের স্ত্রীর। "ভাল আছি বাবা। বাড়িতে সবাই ভাল তো?"

কুশল বিনিময় চলতেই থাকে অনেকক্ষণ ধরে। রুহিন দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে।

"আরে রুহিন? দরজায় দাঁড়িয়ে কী করছিস। আমি তোকে খুঁজছিলাম।" পরশ রুহিনকে জড়িয়ে ধরে সবার সামনে দাঁড়ায়।

"বাহ্ বড় হয়ে গেছিস তো? কোন ক্লাসে এখন?"

রুহিন আহ্লাদে বলে পঞ্চম শ্রেণীতে। পরশ ভাইয়া তুমি আগের মতো নেই। বেশ চটপটে হয়ে গেছো। তুমি নাকি পরীক্ষায় খুব ভাল করেছো?"

"তুই-ও পারবি। মন দিয়ে পড়ালেখা কর। ভাল ভাল বই পড়বি। দেখবি জ্ঞানের পরিধি আরো বাড়বে।"

বাসায় হৈচৈ আর থামে না। সবাইকে কাছে পেয়ে পরশ আনন্দিত। পরশের আরো আনন্দ যে রমিজ চাচার অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। দোকান বড় হয়েছে। বাসায় ছোট ড্রইংরুম। খাওয়ার ঘর। রমিজ চাচার অবস্থার উন্নতি দেখে পরশের আনন্দ হয়। মানুষ তো একটু একটু করেই বড় হয়। ভেতরে অস্থিরতা। সবাই বলছে ভাল ফল করেছিস। কোথায় পড়বো সে কথা কেউ জানতে চাইলো না। ভেতরটা অস্থিরতায় কাটে।

এদিকে চাচী হাঁক ডাক শুরু করে দিয়েছে। "কই সবাই খেতে এসো। রাত হলো কত খেয়াল আছে। কত দূর থেকে এসেছে। তোমাদের খেয়াল নেই। এসো বাবা পরশ। বড় ভাইজান আসুন। রনি রবি সবাই এসো তো।"

"রমিজ হেসে বলে আমি খাবো না?"

"খাবে না মানে? সবাইকে নিয়ে তো তুমিই আসবে। টেবিলের খাওয়া ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।"

খেতে বসে রমিজই কথাটা উঠায়। "পরশ কী ঠিক করেছিস কোন কলেজে, কোথায় পড়বি। তোর যে ফল। ভাল কলেজে পড়তে তোর কোন অসুবিধা হবে না।"

সবুরই পরশের হয়ে উত্তর দেয়।

"পরশ বাবা যে ঢাকা কলেজে পড়তে চায়। পারবে তো?"

রনি খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। হ্যাঁ হ্যাঁ পরশ ভাই ঢাকা কলেজে অনায়াসে ভর্তি হতে পারবে। জি. পি. এ পাঁচ দেখলে কলেজ কর্তৃপক্ষ পরশ ভাইয়াকে লুফে নেবে। "চলো পরশ ভাই কালই ঢাকা কলেজে ভর্তির বিষয়ে বিস্তারিত জেনে আসি।"

"হ্যাঁ তাই কর রনি। পরশকে নিয়ে কাল ঢাকা কলেজে ঘুরে আয়। তারপর যা করার করা যাবে।" রমিজ উৎসাহের সাথে কথাটা বলে।

"আমি পরশকে বলেছি। আর সেও জানে রমিজ তুইও জানিস আমার যে অবস্থা ঢাকা শহরে রেখে ওকে পড়ানোর সামর্থ্য কী আছে? কিন্তু ওর ইচ্ছে ঢাকা কলেজেই পড়বে। এ ব্যয় ভার আমি কতটুকু নিতে পারবো।"

"ভাইজান, ওর ইচ্ছেটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ওর প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা তো আছে। সে কথা তো ভুলে গেলে চলবে না। আগে ভর্তি হউক। তুমি ওকে কোলে পিঠে মানুষ করেছো। কিছু দায়বদ্ধতা তো আমারও আছে। কোন চিন্তা করবেন না।"

"বাবা স্কুলে পড়ার সময় ছুটির পরে আমি টিউশনি করেছি। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেতো। তোমার উপর বাড়তি চাপ দিতে চাইনি। অঙ্কে, বিজ্ঞানে, কমার্সে কম্পিউটারে আমার পারদর্শিতার কথা ভেবে শিক্ষকরাই স্কুল ছুটির পর আমার টিউশনির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

"ধ্যাৎ কী যে বলছিস পরশ। এ সব বিষয়ে পরে ভাবা যাবে। নিশ্চিন্তে থাক তো। কাল রনির সঙ্গে ঢাকা কলেজ ঘুরে আয়। রনি, রবি, রুহিনের মতো তোর প্রতি ও আমার দায়বদ্ধতা আছে। মুক্তিযুদ্ধ করেছি। তুই আরেক মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমাদের দু ভাইয়ের তোর প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। সোনার বাংলায় সোনার মানুষ হবি তুই।"

পরশের মুখ খানা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মাথায় ভেতর জটপাকে ওর এলোমেলো চিন্তায়।

"কী হলো মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল যে?" রমিজের কথা স্মিত হেসে পরশ মাথা নেড়ে বলে। "নাহ্ কিছু নয় তো। আপনারা আছেন আমার অভিভাবক। অবশ্যই আমার শ্রম অধ্যাবসায় সেটি তো আমার নিজের তাগিদেই করবো। মুক্তিযুদ্ধের উপর যখন যে বই পেয়েছি পড়েছি। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে আমি ও গর্বিত।"

রমিজ পরশের হাত খানা নিজের হাতে তুলে বলে "জয় বাংলা।"

রনি ও পরশ পরের দিন চলে যায় ঢাকা কলেজে। সঙ্গে সবুরও পরশকে একা ছাড়তে ইচ্ছে হলো না। ঘরে চিন্তা করার চাইতে সঙ্গে যাওয়াই ভাল। সি.এন.জিটা গেইটেই বিদায় করে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় ওরা। কিন্তু কার কাছে যাবে দ্বিধায় পড়ে যায় পরশ। গেইটের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় কোথায় অধ্যক্ষ স্যার বসেন কোথায় অফিস। দারোয়ানের নির্দেশ মত ওরা চলে যায় কলেজে। কলেজে ঢুকতেই হাতের বায়ে অধ্যক্ষ স্যারের রুম। ডানে অফিস।

"বাবা আগে অফিসে যাই। ভর্তির খবরাখবর ওখানেই জানা যাবে।"

আহ্ বাবা চল আগে অধ্যক্ষ স্যারের ঘরে যাই। উনি নিজ চোখে দেখুক তোর কাগজ পত্র।"

পরশের বুকটা কেঁপে উঠলো। ওরে বাপরে স্বয়ং অধ্যক্ষ স্যারের ঘরে? তাও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ। পরশের বুকটা ধক ধক করছে।

"আরে কী করছিস? চল ভেতরে চল।" সবুরের কথায় পরশের সম্বিত ফিরে আসে। হ্যাঁ চলো।"

বাবা বেটা সোজা ঢুকে যায় অধ্যক্ষের ঘরে।

"কী চাই? কে আপনারা?" অধ্যক্ষ গম্ভীর ভাবে বলে। সবুর হাত দুখানা করজোড়ের মত করে বলে।

"আমার ছেলেকে নিয়ে এসেছি। গোরীপুর থেকে। ভর্তির ব্যাপারে জানতে এসেছি স্যার।"

লুঙ্গি আর পাঞ্জাবী পরা সবুরের আকুতি ঝরে পড়ে "ভর্তির ব্যাপারে জানতে হলে অফিসে যান।"

"স্যার আমার ছেলেটাকে নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছি। ওর কাগজ পত্রগুলো আপনাকে দেখাতে চাই। আমরা গাঁও গেরামের মানুষ। বড় শখ করে আপনার ঘরে ঢুকেছি। দেখুন না স্যার দয়া করে। এই আমার ছেলে পরশ। ভাল নাম পরশ আল মাহ্মুদ। স্যার দয়া করুন।"

"কী ফল করেছে দেখি কাগজপত্র।"

পরশ কম্পিত পায়ে অধ্যক্ষের সামনে তুলে ধরে কাগজগুলো। অধ্যক্ষ মনোযোগের সঙ্গে পরশের Result এর কাগজগুলো দেখে চোখ তুলে দেখে পরশের দিকে। ভদ্র নম্র অতি সাধারণ পরশের দিকে তাকিয়ে। স্মিত হেসে বলেন—"বাহঃ খুব ফল করেছো তো। অঙ্ক, বিজ্ঞান সব বিষয়ে সর্বোচ্চ নাম্বার। ভর্তি হতে আরো দু সপ্তাহ বাকি। আমি তোমার দেয়া ও কাগজে লিখে দিচ্ছি ভর্তি করা হউক।" অধ্যক্ষের সবুরকে দেখে মন গলে যায়। আপনি বসুন। গ্রামে কী করেন আপনি?"

সবুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—"আগে মাঝি ছিলাম। দীর্ঘ বছর নৌকা বৈঠা আর নদী নালার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। ৭১ এ মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে সীমান্তে পার করে দেবার কাজ ছিল, পবিত্র কাজ। স্বাধীনতার পরও বহু বছর নৌকাই ছিল আমার

রোজগারের এক মাত্র উপায়। এখন বয়স হয়ে গেছে। বড় ছেলেকে মেট্রিক পাশ করিয়ে আর পড়াতে পারিনি। একটা মুদি দোকান দিয়ে ওকে কাজে লাগিয়ে দিলাম। এ ছেলেটি নিজ চেষ্টায় এতো ভাল ফল করেছে বড্ড সাধ ওকে ঢাকা কলেজে পড়াই। যত কষ্টই হউক আমি ওর খরচ চালাবো। স্কুলে থাকতেই ছেলেটি টিউশনি করেছে। সুযোগ পেলে কলেজে পড়াশোনার ফাঁকে তাই করতে রাজী সে।"

"আপনার ছেলে যে ফল করেছে কলেজ থেকেই বৃত্তি পাওয়ার ব্যবস্থা হবে। কী নাম যেন তোমার?" অধ্যক্ষের প্রশ্নে পরশ কম্পিত কণ্ঠে বলে পরশ।" "অফিস রুম থেকে বিস্তারিত জেনে যাও। আমার কাগজ খানা ওদের দেখিও। ওর নাম মির্জা। দু'সপ্তাহ পরে এসে ভর্তি হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো।" আচ্ছা স্যার— সালাম দিয়ে ওরা বেরিয়ে যায়। অফিস ঘরে ঢুকে ভর্তি সংক্রান্ত সব খবর নিয়ে আনন্দ উল্লাসে তিনজনেই বেরিয়ে পড়ে। কলেজ বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে রনি পরশকে জড়িয়ে ধরে। "পরশ ভাইয়া জগৎ জয় করে ফেলেছো। ইস আমি যদি এমন ফল করতে পারতাম। লক্ষ করেছো অধ্যক্ষ স্যার প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে তোমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। পরশ ভাইয়া তুমি জগৎটাকে জয় করে ফেলেছো। ভবিষ্যতেও করবে জ্যাঠা মিষ্টি খাওয়াবেন না?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ চল মিষ্টি খাই। মিষ্টি বাসার জন্যও, আশে পাশে মিষ্টির দোকানে আছে।"

"আছে আছে সামনে বের হলেই নিউ মার্কেট, হকার্স মার্কেট। সারি সারি মিষ্টির দোকান। চলো যাই।"

কেউ জানে না পরশের ভেতরে কী তোলপাড় চলছে। ঝাপসা স্মৃতি, ওর শৈশব, কৈশোর। কেউ তা জানে না। ঝাপস স্মৃতি ওর ভেতরটাকে ওলট পালট করে তুলছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সবুরের হাতটা চেপে ধরে। আবেগে কাঁপছে পরশ। সবুর মনোলোকের আলোয় বুঝতে পারে। পরশকে বুকে জড়িয়ে বলে "এতো ভাবনা কিসের রে? আমি আছি, ছিলাম। এখন আছে রনি, রবি, রমিজ। কোন ভাবনা নেই তোর। চল মিষ্টি খেতে চল।"

দোকানে ঢুকে তিনজনে মিলে মিষ্টি খায়। গ্রামে তো এতো হরেক রকমের মিষ্টি পাওয়া যায় না। রনিই তার পছন্দ মতো অর্ডার দেয়। সবুর বিলটা দিয়ে বাসায় জন্য এক প্যাকেট নিয়ে নেয়। দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে। ঢাকা শহরটাকে চোখ মেলে দেখে। কী এক চিন্তার বোঝা নেমে যায় পরশের মাথা থেকে। একটা সি.এন.জি ডেকে উঠে পড়ে তিনজনে। "চলো আগে চাচার দোকানে যাই। চাচাকে সালাম করে তারপর বাড়ি। কী বলিস রনি?"

"হ্যাঁ তাই হউক।"

রমিজ তিনজনকে হাসতে হাসতে দোকানে ঢুকতে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। সবুরের হাতে মিষ্টিরবাক্স কিছু না শুনেই উঠে এসে পরশকে জড়িয়ে ধরে বলে "ভাতিজা আমার জয় করেই ফিরেছে।"

পরশ রমিজকে কদমবুচি করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। এবার রমিজ পরশকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে "জয় বাংলা বাংলার জয়।"

"চাচা এ কথাটা কেন বললেন? সুখবরের সঙ্গে একবার সম্পর্ক কী?"

"জয় বাংলা স্বাধীনতার শ্লোগান। তুই স্বাধীন বাংলার গর্বিত সন্তান–বাংলার জয় নয় কী?"

কী গভীর অর্থবহ এ কথাটি পরশের বোধের মধ্যে ঝাপসা হয়েই রইলো। কোন উত্তর না দিয়ে একথা নিঃশ্বাস ফেলে শুধু বল্লো "হা তাই।"

সবাই রমিজের অফিস রুমে বসে। সবুর বিস্তারিত সব বলে যায়।

রমিজ পরশের দিকে তাকিয়ে বলে "আমি জানতাম।"

সবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকায় রমিজের দিকে।

"কিছু বলবে ভাইজান?"

"বলছিলাম ভর্তি হতে দুসপ্তাহ বাকি। কালই আমরা গ্রামে ফিরে যাই। সপ্তাহের আগেই ফিরে তো আসতেই হবে। জোগাড় যন্ত্র করতে হবে না?"

"এতো তাড়া কিসের ভাইজান। আমি তো আছি। জমি বন্ধক দিতে পারবে না কিন্তু।"

তবে বলে কিছু নেই। বাড়ি যাচ্ছেন যাবেন। তবে কালই নয়। "হারে পরশ ঠিক করেছিস কিছু? বিজ্ঞান, মানবিক কমার্সে পড়বি?"

"কমার্সেই পড়বো।"

পরশ ভাইয়া তুমি তো অঙ্ক বিজ্ঞানেও বড় মাস্টার। রনির কথায় পরশ বলে "আচ্ছা দেখা যাবে যখন ভর্তি হতে যাবো।"

"বাবা এবার আমরা বাসায় যাই। মাতো খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। বিকেলে পরশ ভাইকে নিয়ে ঢাকা শহর ঘুরতে বের হবো। কিছু টাকা দাও।"

রমিজ ক্যাশ বাক্স খুলে পাঁচ হাজার টাকা পরশের হাতে দিতেই পরম চমকে উঠে।

"চাচা টাকা চাইলো রনি। আমাকে....। শোন রনি এ পাঁচ হাজার পরশের জন্য। বিকেলে কাওরান বাজারে ওকে নিয়ে ওর প্যান্ট শার্ট জুতা সেন্ডেল যা লাগে কিনে নিবি। এ-ই পাঁচ শত টাকা তোর।"

পাঁচ শত টাকায় হবে না বাবা। আরো পাঁচ দাও। আরে পরশ ভাইয়াকে নিয়ে বের হচ্ছি। শহীদ মিনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী, পাবলিক লাইব্রেরি আর্ট কলেজ ভাইয়াকে নিয়ে জায়গাগুলো ঘুরে আসবো। আর ক্ষিধে পেলে কিছু খাবো। দাওতো পাঁচ শত টাকা। জানতো তোমার ছেলে ফালতু কাজে টাকা উড়ায় না। দাও তো দাও।"

রমিজ আরো পাঁচ শত টাকা পকেট থেকে বের করে হাতে দিয়ে বলে "তাড়াতাড়ি বের হবি। পরশের কেনা কাটা আগে সেরে তবে বের হবি।"

"চাচা আমার প্যান্ট শার্টে কোনই দরকার নেই। যা আছে তাতেই চলবে। লাগলে বলব। থাক না চাচা।"

যা বলছি তাই কর।

রনি পরশ সবুর বাসার দিকে রওনা হয়। রমিজ তাকিয়ে থাকে পরশের চলে যাওয়ার দিকে। মনে মনে বলে কী দুর্ভাগা ছেলে! পরশকে বুকে জড়িয়ে সে কিছু বলবে। সাহস হয় না। ভাগ্য মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কাজে মন দেয় রমিজ। কাজ মন বসে না। ইচ্ছে হয় পরশকে

বুকে জড়িয়ে রাখতে। রমিজ ভাবে সব ভাগ্য। সময়ের উপরেই ছেড়ে দেয়া ভাল।

কাওরান বাজার থেকে চটপট পরশের কেনাকাটা করে রমিজের দোকানে রেখে ওরা বের হয়। রনি, রবি, পরশ পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগোয়। চারপাশে রকমারি দোকান মানুষের চলাচল যানজট সব কিছুকে গভীর মমত্ব বোধে দেখে। মনে মনে ভাবে ভাগ্য মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়। মেঠো পথ গ্রাম ছেড়ে আসা পরশের কাছে সবই সুন্দর মনে হয়। এক সময় ক্লান্ত হয়ে তিনজনে রিক্সায় উঠে বসে। এতো মানুষ, এতো যানযটের মধ্যেও ঢাকা শহরকে লীলা বৈচিত্র্যের এক তীর্থ ক্ষেত্র মনে হয় পরশের। পরশ আবেগ প্রবণ হয়ে উঠে। পথে যেতে যেতে রনি পরশকে আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দেয় এটা এ জায়গা ওটা এ জায়গা রিক্সা এসে থামে শহীদ মিনারের পাদদেশে। রনি বলে "এ হলো শহীদ মিনার" পরশ মাথা নত করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে চোখের পাপড়ি ভিজে যায়। ওর অন্তরে বাহিরে কি আলোর ছটা অনুভব করে। শহীদ মিনারের পাদদেশে তিন জন বসে। গ্রামে বসে শহীদ মিনারের কথা শুনেছে। বইতে পড়েছে। একুশের খবর পত্রিকায় পড়েছে। কত সাধ ছিল এ শহীদ মিনারে এসে শ্রদ্ধা জানাবার। উপরওলা সে সাধ আজ পূরণ করেছে। শহীদ মিনারে হাঁটু গেড়ে পরশ চিৎকার করে বলে—

দুঃখ আমার আজি হলো যে ধন্য
মৃত্যু গহণে লাগে অমৃত সুগন্ধ
এলে কারাগারে রজনীর পারে ঊষাসম
মুক্তি রূপা আমি লক্ষ্মী দয়াময়ী।

"পরশ ভাইয়া কত পড়ালেখা আছে। আমরা শহরে বসে কিছুই পড়িনি। কেবল পাঠ্য পুস্তক।"

"পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও অনেক পড়তে হয়। নইলে যে জগৎ সংসারের দুয়ার খুলবে না রে।" পরশ ভাব গম্ভীর ভাবে কথাটা বলে উঠতে চায় "আরো কোথাও যাবি বলছিলি না? চল।"

ওরা চলে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরশ তাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ভবনের দিকে। এখানে আসতে হবে মাথা উঁচু করে বেরও হতে হবে। অপেক্ষা শুধু সময়ের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা একাডেমী। বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ জ্ঞান-বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। প্রতি বছর বই মেলায় এ একাডেমী হয়ে উঠে পাঠক, লেখক আর প্রকাশকদের প্রাণকেন্দ্র। সামনের বই মেলায় আসতে পারার আনন্দ ওকে ভরিয়ে তোলে। ঘুরে ঘুরে বাংলা একাডেমী দেখে চলে যায় পাবলিক লাইব্রেরিতে। সিঁড়ি ভেঙ্গে লাইব্রেরিতে ঢুকে সেলফে অসংখ্যা বই সাজানো দেখে পরশ ভাবে এটিই আমার আসল ঠিকানা। আনন্দময় সময় কাটাবার উপযুক্ত স্থান। পাবলিক লাইব্রেরি দেখে পুলকে ওর মনটা নেচে উঠে। "তোরা এখানে পড়তে আসিস?" রনি ও রবির কাছে জানতে চায় পরশ।

"হ্যাঁ আসি। বন্ধুদের নিয়ে সিঁড়িতে বসে আড্ডা মারতে আসি।"

"শুধুই আড্ডা? লাইব্রেরিতে পড়তে যাসনে?"

"নাহ। গাদা গাদা বই। কোন বইটা পড়বো তাও জানি না। এখন তুমি এসেছো তোমার সঙ্গে আসবো। সত্যি পরশ ভাইয়া তুমি এসে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছো। তোমার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। ভাগ্যিস তুমি ঢাকায় পড়তে এসেছো।" ফেরার পথে জাতীয় যাদুঘর দূর থেকে দেখে শাহাবাগে স্ন্যাক্সের দোকানে তিনজনে এসে বসে।

"বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। ভাল খাবার অর্ডার দে রনি" রবি আহ্লাদে বলে।

"কী খাবি বল?"

"তোমার যা পছন্দ।"

"কী ব্যাপার পরশ ভাইয়া তুমি কিছু বলো কী খাবে?" যা ইচ্ছে তাই অর্ডার কর। আমার কোন পছন্দ অপছন্দ নেই।"

রনি অর্ডার দেয়। যথারীতি খাবার টেবিলে আসে। তিনজনে মহা আনন্দে খায়। খেতে খেতে রবি বলে "ভাগ্যিস পরশ ভাইয়া তুমি ঢাকায় এসেছো। আমাদের দু ভাইয়ের জন্য বড় পাওয়া। এক বিকেলেই তোমার সান্নিধ্যে আমাদের চোখে নতুন আলো পড়েছে।"

পরশ রনি রবির কাঁধে হাত দিয়ে বলে "সবে তো এলাম। ভর্তি হওয়াটাই এখন বড় কাজ। আমি তোদের বড় ভাই তোদের গাইড করার জন্য যা করা তাই করবো। তোদেরও ভাল Result করতে হবে।

আড্ডা মারতে মারতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত আটটা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পরশ বলে চল বাসায় ফিরি।

"হ্যাঁ হ্যাঁ চলো। বাসায় সবাই চিন্তা করবে" কথাটা বলে রনি উঠে দাঁড়ায়। তিনজন বেরিয়ে আসে। রাস্তায় ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা রিক্সা ডেকে উঠে বসে।

পরশ ভাই তুমি কবিতা আবৃত্তি করতে পার। গান পার না? খোলা রিক্সায় রনি রবির আবদার।

"একটু আধটু গাইতে পারি। তেমন কিছু নয়।"

"তবে গাও না একটা গান। কবিতা শুনলাম। গানটা বাকি থাকবে কেন?" রবির আবদার ফেলতে না ফেরে পরশ গায়—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পূর্ণ করো—
এ জীবন পূর্ণ করো।

"এখন গান গাওয়ার মুড নাইরে। বড্ড ক্লান্তি লাগছে। সকাল থেকে ছুটোছুটি। কাল কী করবি বল?" কমার্স কলেজে আমার বন্ধুর বড় ভাই পড়ে। তুমি তো কমার্স পড়বে। তোমাকে নিয়ে যাবো কাল তার কাছে। তোমার জন্য ভাল হবে। উনি তোমাকে কিছু পরামর্শও দিতে পারবে।" রনির কথাটা মন্দ নয়। কলেজটাও দেখা যাবে। কিছু ধারণাও পাওয়া যাবে। মন্দ নয়। পরশ রনির কথায় সায় দেয়। কথা বলতে বলতে রিক্সা এসে থামে বাসার সামনে। ঘরে ঢুকেই পরশ লক্ষ করে সবুর রমিজ রমিজের স্ত্রী বেশ উৎকণ্ঠায় আছে। পরশ বুঝতে পারে ওদের ফিরতে দেরীর কারণেই এ উৎকণ্ঠা।

খুব চিন্তিত কেন আপনারা? আমাদের জন্য? আমরা তিন ভাই অনেক ঘুরে বেড়ালাম। অনেক ভাল ভাল জায়গা আমার দুই ভাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। খুব ভাল লাগলো। পরশের কথায় রমিজ হেসে বলে—"সন্ধ্যার পর রনি, রবি বের হয় না। তোকে নিয়ে ওরা দুজন কোন বিপদে পড়েনি তো? স্কুল আর বাসা এ ছাড়া ওরা তো বের হয় না। যাক ভালই ভালই ফিরে এসেছো।"

"বাবা আমাদের তুমি এখনও ছোট মনে করছো। আমরা কিন্তু বড় হয়ে গেছি। দেখলে না পরশ ভাইয়াকে কত জায়গা ঘুরিয়ে এনেছি।" রনির কথায় ওর মা হেসে বলে "পরশের সঙ্গে ঘুরে একদিনেই বড় হয়ে গেলি? কিন্তু পরশের মতো ভাল ফল করতে হবে বুঝলি?" বসার ঘরে আবার আড্ডায় মাতে সবাই। সবুর ও রমিজ হালের রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা করে।

"তোর লীগ কেমন চলছে?"

সবুরের প্রশ্নে রমিজ বলে "শুধু যুবলীগ কেন? গোটা আওয়ামী লীগকে নিয়েই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। বুঝলি পরশ ত্রিশ লাখ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা। তোরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তি হয়ে সোনার ছেলে হবি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা তো সোনার মানুষ না হলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ হবে কী করে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঋণ যে এখনও শোধ হয়নি। কত সোনার মানুষ হারিয়েছি। রক্তের বন্যা বয়েছে সোনার মাটিতে। কত সন্তান মা বাবা হারিয়েছে। এতো ত্যাগের বিনিময়ে এ দেশ। যারা হারিয়েছে তারাই বোঝে মর্ম বেদনা। এ বেদনাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে বাংলার মানুষকে সোনার মানুষ হয়ে উঠতে হবে। দলকে শক্তিশালী করেই শত্রুর মুখে ছাই দিতে হবে।" পরশের মুখটা নীলাভ হয়ে উঠে। বাকরুদ্ধ হয়ে যায় সে। পরশের যেটুকু স্মৃতি আছে-সেটুকুই বুকে নিয়ে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে। শুধু একটিই প্রত্যয় ভাল ভাবে লেখাপড়া করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। মনের সঙ্গোপনে রাখা কথাগুলো সমতনে লুকিয়ে রাখে।

"চাচা আপনিও কী মুক্তিযুদ্ধ করেছেন?"

"করিনি মানে? একেবারে অস্ত্র হাতে শত্রু নিধন করেছি।"

"আর বাবা?"

"তোর বাবাও মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ভাইজানের কাজ ছিল নৌকা করে মুক্তিযোদ্ধাদের" ... রমিজ বলে "যাক ওসব কথা। চলো খাই। ভাবী কখন থেকে টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছে। কাল পরশকে নিয়ে বাড়ি যাই? দু সপ্তাহের আগেই তো ফিরতে হবে আবার।"

"কাল যেও না জ্যাঠামনি। পরশ ভাইয়াকে নিয়ে কমার্স কলেজে যাবো ভাবছি।"

"গ্রাম থেকে ফিরে আসি। হুট করে চলে এসেছি। এবার সবদিক গুছিয়ে আসবো। পরশ তো ঢাকাতেই থাকছে। তখন যত ইচ্ছে তত ঘুরিস।" "রমিজ কালই যাই আমরা"।

"ঠিক আছে ভাইজান। যেতে চান যাবেন। হাতে সময় নিয়ে আসবেন। আপনাকে নিয়ে আমার আওয়ামী লীগের অফিস, যুব লীগের অফিসগুলো তখন ঘুরিয়ে দেখাবো।"

সারারাত পরশের নির্ঘুম কাটে। রমিজের কথাগুলো ওর ভেতরটাকে নাড়িয়ে

দিয়েছে। কত প্রাণের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা রমিজ চাচা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর কথায় গর্ব, প্রত্যয় বিশ্বাস মুক্তিযুদ্ধে কত মা স্বামী হারিয়েছে। বাবা হারিয়েছে। রমিজের এ কথা গুলো পরশের ভেতরে তুফান বয়ে চলে। ওর চিন্তার জাল বার বার ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে "হে স্বাধীনতা যে সব সন্তানদের তুমি কেড়ে নিয়েছে তোমার বুকে ওদের ঠাঁই দিও। তুমি পাশে থেকো। শক্তি দিও। তোমার মর্যাদা যেন ও এতিম সন্তানরা রক্ষা করতে পারে। দুচোখ ভরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে পরশের। বিছানা থেকে উঠে এসে দাঁড়ায় জানালার পাশে। চোখ মেলে তাকায় বাইরে। আকাশে তারাদের মেলা। এ বিশাল আকাশে তারাদের মতো নিজকে এদেশের তারকা মনে হচ্ছে। স্বাধীনতার আকাশে একজন মুক্তিযুদ্ধের সন্তান হিসেবে তারকা হয়েই জ্বলবে। দৃঢ় প্রত্যয় জাগে পরশের মনে।

রনি পাশ ফিরে দেখে পরশ বিছানায় নেই। উঠে বসে রনি দেখতে পায় পরশ জানালার কাছে দাঁড়ানো। "পরশ ভাইয়া তুমি এতো রাতে আকাশ দেখছো বুঝি। এসো তো শুয়ে পড়ো। রাত কত হয়েছে ঠাওর করতে পারো? এসো শুয়ে পড়। এসো তো এসো।"

দু সপ্তাহের আগেই সবুর পরশকে নিয়ে ঢাকা পৌঁছে যায়। ঢাকায় ফিরতে রাত নটার মতো বেজে গেছে। তাই দোকানে না গিয়ে বাসায়ই পৌঁছে যায়। রমিজ ও মাত্র ঘরে ঢুকেছে। রমিজ নিজে ও মনে মনে অস্থিরতায় ছিল ওরা কবে গ্রাম থেকে ফিরবে, যাক ভাই ও পরশকে দেখে শুধু রমিজই নয় বাসায় সবারই মহা আনন্দ।

"ভাইয়া তোমাদের পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে উঠতো"। রনি জড়িয়ে ধরে পরশকে। "গ্রামে আমিও অস্থিরতায় ছিলাম কবে ঢাকায় ফিরবো। গ্রামের বন্ধুদের সাথে ভাল করে সময় কাটাতে পারলাম না।"

"কই চাচী ক্ষিধে পেয়েছে।" পরশ ওর চাচীর পা ছুঁয়ে সালাম করে বলে। পরশের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে "হাত মুখ ধুয়ে নে। আমি খাবার দিচ্ছি।"

খাওয়া দাওয়া সেরে বসার ঘরে চুটিয়ে আড্ডায় মাতে। সবুর ডেকে বলে "তোরা ঘুমাতে যা। কাল পরশকে নিয়ে তো বের হতে হবে।"

"হ্যাঁ যাই বাবা। কাল তো ঢাকা কলেজে একবার ঘুরে আসতে হবে।"

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে বাপ-বেটা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নেয়। রনি রবির স্কুল আছে বলে পরশের সঙ্গে যাবার ইচ্ছা থাকলেও মায়ের ভয়ে কিছু বলেনি। পরশেরও মনটা খারাপ হয়ে যায়। বাস্তবতা বুঝে কিছু বলে না। সবুর নিজেও চেয়েছে শুধু পরশই ওর সঙ্গে থাক। কারণ সবুরের ইচ্ছে সুযোগ পেলে অধ্যক্ষ স্যারের সঙ্গে একান্তে কিছু বলবে। কিন্তু কী বলবে কিভাবে বলবে বা আদৌ কিছু বলা উচিৎ হবে কিনা সবুরের ভেতর এ নিয়ে নানা তোলপাড় হচ্ছে। পরশকে কিছু বুঝতে না দিয়েই দুজনে বেরিয়ে পড়ে। ঢাকা কলেজে ঢুকেই বাপ বেটা সোজা অফিস কক্ষে চলে যায়। অফিস স্টাফের কাছেই জানতে পারে অধ্যক্ষের সুপারিশকৃত পরীক্ষার ফলাফল ও স্কুলের টেসটিমনিয়াল সহ দুদিন পরেই অফিস তা

জমা নেবে। সাতদিন পর বাইরে নোটিশ বোর্ডে ভর্তির সুযোগ পাওয়া ছাত্রদের নাম প্রকাশ পাবে। তবে কাগজ পত্র অফিসেই জমা দিতে হবে। অফিস নিজ দায়িত্বেই অধ্যক্ষের কাছে জমা দেবে। জমা দেবার সময় ভর্তি ইচ্ছুকদের স্লিপ দেবে।

"বাবা সঙ্গে তো সবই আছে। আজই জমা দিয়ে দেবো?" পরশ আগ্রহের সঙ্গে বলে।

"ধ্যাৎ শুনিসনি দুদিন পর থেকে জমা নেয়া শুরু করবে? এতো চিন্তা কিসের শুনি?" সবুর মৃদু ধমকের সুরে বলতে বলতে পরশকে নিয়ে অফিস কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। কী যেন ভাবে সবুর।

"কী ভাবছো বাবা?"

"অধ্যক্ষ স্যারের সঙ্গে একটু দেখা করবো কিনা তাই ভাবছি।"

"আমরা তো প্রথম দিন এসেই দেখা করে কাগজপত্র দেখিয়েছি। তখনই তো বললেন ভাল Result। তুমি ভর্তি হতে পারবে। আজ আবার কেন? ওরে বাপরে আমার ভয় লাগে।"

"এতো দিনের কথা কী তাঁর মনে আছে। কত ছাত্র-ই তো আসে তাঁর কাছে। তোর কথা কী মনে থাকার কথা? চল ঢুকে পড়ি।" বলেই পরশের হাতটা ধরে সোজা অধ্যক্ষ স্যারের রুমে ঢুকে লম্বা করে একটা সালাম ঢুকে বললো, "স্যার আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"

কে আপনি? কী ব্যাপারে কথা বলবেন। ভর্তির ব্যাপারে হলে অফিসে খবর নিন।"

আধ ময়লা পায়জামা পাঞ্জাবী পরা সবুরের দিকে তাকিয়ে কথা গুলো বলে অধ্যক্ষ আবার নিজের কাজে মন দেয়।

"স্যার আমি গাঁও গেরামের মানুষ। অনেক দূর থেকে এসেছি। আমার ছেলের ফলাফলের কাগজটা দেখিয়ে মন জুড়াতে চাই। ছেলের জন্যই তো আসা। নইলে আমার মত মানুষ তো এ ঘরের চৌকাঠও পার হতে পারতাম না। দয়া করেন স্যার।"

ভাগ্যিস অধ্যক্ষের ঘরে অন্য কেউ ছিল না। নইলে সবুর সাহস করে বোধ হয় কথাগুলো বলতে পারতো না।

সবুরের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে অধ্যক্ষ স্যার বললেন—"আপনার ছেলে?"

"জ্বী স্যার।"

পরশের দিকে তাকিয়ে অধ্যক্ষ স্যার বললেন—"দেখি তোমার কাগজ পত্র।"

পরশ বিনয়ের সঙ্গে স্যারের হাতে কাগজপত্রগুলো তুলে দেয়।

অধ্যক্ষ স্যার এক পলকে কাগজ পত্রগুলো দেখে বললেন "বাহ্ খুব ভাল করেছো। দুদিন পরের এসে অফিসে এগুলো জমা দিয়ে Slip নিয়ে নিও। আশা করি তুমি ভর্তি হতে পারবে।"

"পরশ তুই কাগজ পত্র গুলো নিয়ে বাইরে যা। কলেজটা ঘুরে দেখ। স্যারের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।" পরশ বাপের দিকে চোখ বড় করে তাকায়, কী কথা?" "তুই যা আমি আসছি।" সবুরের কথায় পরশ বেরিয়ে যায়।

"দেখছেন না আমি কাজ করছি। কী কথা বলবেন আবার। ভর্তি হতে পারবে বললাম তো।"

ভর্তি হতে পারবে এ আমার সৌভাগ্য। এ কারণেই কিছু কথা বলার আছে। আজ থেকে আপনি পরশের অভিভাবক।

"কী বলবেন বলুন।"

একটা টানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সবুর বলে—"যে কথা আজ পর্যন্ত কাউকেই বলিনি। কেবল যন্ত্রনাটা ভেতরে পুষে রাখতে রাখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"এতো কথা না বলে আসল কথাটা বলুনতো।"

"স্যার আপনি কী মুক্তিযুদ্ধ করেছেন?"

"মুক্তিযুদ্ধ? যে যুদ্ধ দেশটাকে স্বাধীন করেছে। এমন মহৎ কাজে দেশের জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করাটাই আমার জীবনের স্মৃতি। তা... হঠাৎ মুক্তিযুদ্ধের কথা? আপনিও কী মুক্তিযুদ্ধের মহৎ কাজটি করেছেন?"

আমার ছোট ভাই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করেছে একেবারে গেরিলাদের মতো। তখন ওর বয়স ১৯/২০। আমি স্যার অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করিনি। কিন্তু বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা যত্ন করে আমার নৌকায় করে তাদের সীমান্তে পৌঁছে দেয়া ছিল আমার কাজ। এখন বয়স হয়ে গেছে নৌকা চালাই না। বড় ছেলেকে টেনেটুনে মেট্রিক পাশ করিয়ে একটা মুদি দোকান করে দিয়েছি।

"তোমার এ ছেলে তো খুবই ভাল ফল করেছে।" অধ্যক্ষের কথায় সবুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এ ছেলে মুক্তিযোদ্ধার ছেলে।

"মানে?"

দীর্ঘ বছর যে ইতিহাস আমি বুকে চেপে রেখেছি যাকে আজ আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি বিষয়টি আপনাকে জানানোর কেন যে এতো তাগিদ অনুভব করলাম জানি না। ভেতরে ভেতরে সব সময় অপরাধ বোধ কাজ করে। আজও পরশের কাছে কিছু বলার সাহস হয়নি। জানি না ওর স্মৃতিতে কিছু ঝাপসা হয়ে আছে কিনা। আমার সাহস হয়নি ওকে কিছু বলার।

সবুরের কথা শুনে অধ্যক্ষের আগ্রহ বেড়ে যায়। বড় বড় চোখে সবুরের দিকে তাকিয়ে বলেন।

"এতো বড় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আজও প্রণীত হয়নি। এ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভাল করে জানেই না। ভাবতে বড্ড কষ্ট হয়।"

সবুরের চোখে জল গড়িয়ে পড়ে।

"কত শহীদের সন্তান, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কীভাবে জীবনযাপন করছে দেশের মানুষ ও জানে না, জানে না সরকারও। এ বড় অবিচার, অন্যায়।"

"হ্যাঁ তাতো বুঝলাম। কিন্তু আপনি আমাকে কি বলতে চাইছেন? কী কথা?"

"স্যার কথাটা শুধু আপনার আমার মধ্যে।"

"ঠিক আছে। বলুন।"

"স্যার দীর্ঘ বছর কথাটি কাউকেই বলতে পারিনি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কষ্টটাকে চাপিয়ে রেখেছি। আপনাকে বলতে পারলে হালকা বোধ করবো। পরশের অভিভাবক এখন আপনিই পরশের আসল পরিচয় আপনার জানা দরকার। পেশা ছিল নৌকা চালানো। '৭১ এর যুদ্ধ যখন শুরু হলো আমরা দুই ভাই দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিলাম। আমার ছোট ভাই বয়স তখন কিইবা হবে ১৯/২০। রমিজ আমাকে ডেকে বললো "ভাইজান আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করবো। তোমার অস্ত্র নৌকার বৈঠা।

সীমান্ত পাড়ি দেবার জন্য শহরগঞ্জের মানুষ গ্রামে আসবে। এখানে থেকেই নিরাপদে সীমান্ত পাড়ি দেবে। যারা আসবে তাদের সাবধানে আতিথেয়তা করে তাদের ইচ্ছে মতো তোমার নৌকা দিয়ে খুব সাবধানে সীমান্ত পার হতে সাহায্য করবে। কাজটি খুব সাবধানে করবে। গ্রামের কেউ যেন জানতে না পারে। রমিজ চলে গেল মুক্তিযুদ্ধে। মাস খানেক পরেই মুক্তিযোদ্ধারা আমার বাড়ি আসতো। আবার সময় মত অপারেশনে চলে যেতো। তারপর শুরু হলো শহর গঞ্জের বুড়া, যুবা-শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত পদস্ত কর্মকর্তার। গরিব মানুষ আমি তাদের লুকিয়ে রাখতাম। ডাল ভাত কিছু জোটাতে পারতাম না। তাতেই তারা খুশি। একদিন ঢাকা থেকে এলেন এক ভদ্রলোক, তার স্ত্রী ও তাদের আড়াই বছরের ছেলে। ভদ্রলোককে দেখেই মনে হয়েছে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। দুদিন থাকার পর তাদের নিয়ে গভীর রাতে রওনা হলাম সীমান্তে। যখন সীমান্তে যেতে না পারতাম-তখন নিরাপদ স্থানে তাদের পৌঁছে দিতাম। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ন মাস এ কাজটি আমার কাছে ছিলো পবিত্র একটি কাজ।

ঢাকা থেকে যে পরিবারটি এলেন দুদিন পরে সময় বুঝে নৌকা চড়িয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য আল্লাহর নামে বের হলাম গভীর রাতে। নিরাপদ স্থানের কাছাকাছি আসতেই প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় আমি কিছুতেই বৈঠা ধরে রাখতে পারছিলাম না। নৌকার চালটা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম দেখে ভেতর থেকে ভদ্রলোক স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে গুলোইয়ের কাছে আসতেই ঝপাঝপ তারা তিনজনেই পানিতে পড়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার। গভীর রাত। পানির ঢেউও প্রচণ্ড। উপায়ন্তর না দেখে আমিও পানিতে ঝাঁপ দিলাম। তারা সাঁতার জানেন কিনা জানি না। মুহূর্তে কী হয়ে গেল। এদিক সেদিক ডুবোডুবি করে ছেলেটাকে উদ্ধার করতে পারলাম। ছেলেটাকে দমকা হাওয়ার ভয়ে নৌকার গুলুইতে বেঁধে আবার পানিতে ঝাঁপ দিলাম। সাঁতরিয়ে ডুবিয়ে কোথাও স্বামী স্ত্রীর হদিস করতে পারলাম না। আমি ফিরে এলাম নৌকায়। ইতিমধ্যে ভোর হয়ে এল। আমার ভয় ছিল দমকা হাওয়ায় ছেলেটি যদি আবার পানিতে পড়ে যায়। কারণ বাঁধার দড়িটা তেমন শক্ত ছিল না। দমকা হাওয়া তখনও শেষ হয়নি। নৌকায় ফিরে দেখি ছোট ছেলেটি হাউ মাউ করে কাঁদছে। চিৎকার করে মা বাবাকে ডাকছে। ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরলাম আর বললাম তোমার মা বাবা সাঁতরিয়ে নিশ্চয়ই তীরে উঠে গেছে। হাওয়া কমুক আমরা নৌকা নিয়ে তীরে যাবো। কত রকমের মিথ্যা সান্ত্বনা যে ওকে দিলাম। সঙ্গে ওর মা বাবা চিড়া মুড়ি গুড় বিসকিট নিয়েছিল। ওকে খাওয়াতে চেষ্টা করলাম। নাহ্ কিছুতেই খেল না। ওর বুক ফাটা কান্নায় আমার বুকের ভেতরটা চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটি ঘুমিয়েই পড়ল। দমকা হাওয়াও কমে এল। ছেলেটিকে বুক থেকে নামিয়ে ওর মা বাবার নেয়া কাপড় গুলো দিয়ে ভাল করে শুইয়ে দিলাম। তারপর আস্তে আস্তে তীরে যাবর চেষ্টা করলাম। তীরে কোন জায়গাটার একটা বিবরণ ও দিয়ে রেখেছিলাম। তীরে উঠে কীভাবে কোন পথে গেলে একেবারে সীমান্তে পৌঁছে যাবে তাও বলা ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল তীরে এসে হয়ত তাঁদের দেখা যাবে। নাহ কোথাও খুঁজে পেলাম না। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা নিরাপদ নয় বলে নৌকায় ফিরে জোরসে বৈঠা চালাতে শুরু করলাম। নিরাপদে

বাড়ি ফেরা তখন বড় কাজ। ছেলেটির কান্না আর থামে না। "আমি আব্বুর কাছে যাবো. আম্মুর কাছে যাবো।" অনবরত চিৎকার করেই চলছে।

"বাচ্চাটির বয়স কত ছিল?" অধ্যক্ষের প্রশ্ন।

"সঠিক বয়স তো বলতে পারব না। সম্ভবত তিনের কাছাকাছি হবে হয়ত।"

"তারপর?" অধ্যক্ষের প্রশ্নে চোখের পানি মুছতে মুছতে সবুর বলে "তারপর আর কী। বুকে আগলে ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। খেতে দিলে খেতে চায় না। ঘুমাতে চায় না। কান্না ও থামে না। আব্বুর কাছে যাবো আম্মুর কাছে যাবো। এ ছাড়া ওর আর কোন কথা ছিল না। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নৌকা নিয়ে দিনের বেলা ঘুরে আসতাম। দোকানে নিয়ে যেতাম। এটা সেটা কিনে দিতাম। সম্ভবত বড় লোকের ছেলে ছিল। আমার কেনা অল্প দামের খেলনায় মন ভরতো না। বলতো ঢাকায় আমার কত খেলনা। আমাকে ঢাকায় দিয়ে এসো। এরকম নানান বায়না। বুক আগলে রেখেছি ছেলেটিকে।

দেখতে দেখতে বড় হতে লাগলো। আমার বড় ছেলের বয়স তখন সাত বছর। ওকে নিয়েও আমার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। গ্রামে পাকবাহিনী আলবদর রাজাকারদেরও উৎপাত। মুক্তিযোদ্ধাদের আমার বাড়িতে আসা যাওয়া। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতাম। এদিকে ছেলেটিকে নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা। সারাক্ষণ মন খারাপ। নাওয়া খাওয়া নেই। মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে বুক আগলে রেখেছি। ঐ দিকে গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা চালিয়ে পার করার কাজটাও বেড়ে গেল।

একদিন পাকবাহিনী আমার বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিলো। দিলো অনেকের বাড়ি। কোন ক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলাম আমরা। পোড়া বাড়ি ছেড়ে বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে গেলাম শ্বশুর বাড়ি। দুর্দিনেও ভেঙ্গে পড়িনি।

"আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। আসল কথাটি কিছু বলার থাকলে বলে ফেলুন আমার হাতে অনেক কাজ।"

অধ্যক্ষে রূঢ় কথায় সবুর থতমত খেয়ে বলে "তবে আজ সংক্ষেপে আসল কথাটি বলি। যা এতো বছর কাউকেই বলতে পারিনি।"

"হ্যাঁ বলুন।"

"স্যার সেদিন বেঁচে যাওয়া সেই ছোট ছেলেটি পরশ। বাবার ভালবাসা দিয়ে ওকে বুকে আগলে শত আর্থিক কষ্টেও লেখাপড়া করিয়েছি। ওকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। কলেজে আর্থিক সহযোগিতার কোন সুযোগ থাকলে ...।

অধ্যক্ষ স্থির দৃষ্টিতে সবুরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। "এতো বড় মহৎ কাজ করেছেন আপনি আমি ভাবতে পারছি না। আজ থেকে এ ছেলে আমারও ছেলে। ওর হোটেলে থাকা এবং কলেজের সকল ব্যয় ভার আমিই নিলাম। ওকে ডাকুন।"

সবুর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পরশের হাত ধরে আবার অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকে।

পরশ জড়ো সড়ো হয়ে এক পাশে দাঁড়ায়।

"তুমি পরশ তাই না?"

"জ্বী স্যার।"

"জানতো পরশ পাথরের স্পর্শে লোহাও সোনা হয়। তুমি সেই পরশ। ভর্তির সময় আমার থেকে টাকা নিয়ে যেও। আজ থেকে তোমার যাবতীয় খরচ কলেজের। তোমার জন্য হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হবে। কাল একা একবার বারটার দিকে এসো। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। আজ তাহলে এসো।"

পরশ এগিয়ে এসে অধ্যক্ষের পা ছুঁয়ে সালাম করে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে।

অধ্যক্ষ বুঝতে পেরে উঠে যায় পরশের কাছে। কাঁধে হাত রেখে বলেন—"আজ থেকে তোমার বাবার মতো আমিও তোমার অভিভাবক। আমার দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা। তুমি অনেক বড় হবে—এ আর্শীবাদ রইলো।" সবুর চোখের পানি মুছতে মুছতে বলে "তোকে একজন মহৎ মানুষের কাছে দিয়ে গেলাম। সোনার মানুষ হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবি। চল এবার বাড়ি যাই।"

কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সায় বসে বাপবেটা। সবুরের ভেতর তখনও আবেগের আলোড়ন। নদীতে ডুবে যাওয়া ছোট শিশুকে বুক আগলে কেমন করে বড় করলো। পরশের স্মৃতিতে কী কিছু আছে? মুখ ফুটে কোনদিন কিছু বলেনি। সাহস করে সবুর কিছু জানতে চায়নি। কিন্তু পরশের মায়া ভরা মুখ খানা দেখলেই স্বাধীনতার লাল সবুজ পতাকাটা ভেসে উঠে। তখন সবুরের বুক খানা চৌচির হয়ে যায়। বুকে জড়িয়ে ধরে পরম আদরে।

"বাবা। এতোক্ষণ কী কথা বললে স্যারের সাথে।"

পরশের এ প্রশ্নে সবুর অপ্রস্তুত হয়ে যায়। নিজকে সামলে বলে "কী আর বলবো। বললাম কী করে তোকে কষ্ট করে বড় করে এ পর্যন্ত তোর আসা। উনি যেন তোর দিকে বিশেষ যত্ন রাখেন।"

"বিশেষ যত্ন শুধু আমার প্রতি কেন? জি.পি.এ পাঁচ আমার মতো অনেকেই তো পেয়েছে।"

"ওরা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। তোর কষ্ট আর ওদের কষ্ট এক নয়। এরকম একটু আধটু বললাম। এই আর কী। আমি তো গ্রামে চলে যাবো। উনিই এখন তোর অভিভাবক। এ সব বললাম আর কী।"

"আগে ভর্তিটা হই তো।"

"হ্যাঁ যা বলেছিস।"

"কাল আমাকে একা আসতে বললেন কেন বাবা?"

"কেন বললেন তা আমি কী করে বলি। হয়ত কলেজের নিয়ম কানুন এ সব হত তোকে বুঝিয়ে বলবে। তোকে স্যারের খুব পছন্দ হয়েছে। লক্ষ্য করেছিস?"

পরশ কিছু বলে না। ঝাপসা স্মৃতিতে ভেতরে তোলপাড় হচ্ছে। রিক্সা চলছে। দুজনে চুপচাপ বসা। দজুনের ভেতরেই চলছে তোলপাড়। এ তোলপাড়ের শব্দ কারো কানেই পৌঁছে না। শুধু বাতাসে মিলিয়ে যায়।

"বাবা!" পরশ সবুরের হাতটা চেপে ধরে।

কিছু বলবি?"

"বলছিলাম আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট করেছো। তোমার আদর স্নেহ ভালবাসা না পেলে আমি এতো দূর আসতে পারতাম না। তোমার উৎসাহেই আমি লেখাপড়া করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। দোয়া করো ইন্টারটাও যেন এমন ফল করতে পারি। তোমার যা আর্থিক অবস্থা কি করে সামলাবে?"

"সময়ই তা বলে দেবে। ভাল কাজে কিছু আটকে থাকে না।"

বাসায় ফিরতেই রনি পরশের হাতখানা ধরে বলে—"পরশ ভাইয়া ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছে তো?"

"নাহ্ আজ নয় কাল পরশু"।

"তবে এতো দেরী হলো কেন? তোমার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"কাগজপত্র নিয়ে কলেজের অফিসে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ছুটাছুটি। আমার ঘাম ঝরে গেছে।"

"চলো বিকেলে দুজনে মিলে ঘুরে আসি।"

"বাবা যে বলছিলেন কাওরান বাজারে যাবে। আমার জন্য দুটো শার্ট আর প্যান্ট কিনবে। ভাল কাপড় চোপড় তো আমার তেমন নেই।"

"ভালই তো আমিও যাবো সাথে। আমিই পছন্দ করে দেবো। তারপর দুজনে ঘুরতে যাবো।"

বাইরে ঘুরে রনি ও পরশ বেশ দেরী করেই বাড়ি ফিরলো। রনিকে দেখেই রমিজ রেগে বলল "পড়ালেখা নেই? কেবল ঘুরে বেড়ালেই হবে। এখন পরশ আছে। পরশের কাছে অঙ্ক ইংরেজীটা পড়ে নিতে পারিস।"

পরশ রমিজের হাতটা ধরে বলল—"চাচা কলেজের ভর্তিটা হয়ে যাক। কলেজ হোস্টেলে সিট পাই কিনা কাল জানতে পারবো। তারপর অবসর সময়ে রনি, রবিকে অঙ্ক ইংরেজি বা বিজ্ঞান আমি এসে এসে পড়িয়ে যাবো।"

"সে কিরে হোস্টেলে থাকবি কেন? আমার বাসা থাকতে তুই হোস্টেলে যাবি তা কী করে হয়।"

চাচা হোস্টেলে যদি সিট পাই যাওয়াই ভাল। পড়ালেখার পরিবেশ পাবো। আপনি ভাববেন না রনি ও রবিকে আমি সুযোগ পেলেই পড়াতে আসবো।"

রমিজ সস্নেহে পরশের হাতটা নিজের হাতে তুলে বলে "একটা কথা বলবো বাবা?"

"হ্যাঁ বলুন চাচা।"

রনি, রবি কোচিং সেন্টারে যায়। কোচিং এ কী শিখে কে জানে। কিন্তু পরীক্ষার ফল তো তেমন ভাল করছে না। তোর ভর্তির ঝামেলা শেষ হউক। তোকেই আমি ওদের প্রাইভেট টিউটর হিসেবে রাখতে চাই। তোরও হাত খরচটা চলে যাবে। তাছাড়া আমি তো আছিই তোর প্রয়োজনে আমাকে কিছু বলতে দ্বিধা করিস না। তোকে ইন্টারেও এরকম ভাল Result করতে হবে। এ ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা আমিই করবো। তুই কিন্তু ভাইজানের ছেলে তা নয়, আমারও ছেলে। বাংলাদেশের ছেলে।"

কথাগুলো বলে রমিজ পরশের হাতখানা নিজের হাতে তুলে চোখ মেলে তাকায় পরশের দিকে। রমিজের চোখের পাপড়ি ভিজে যায়।

পরশ রমিজকে জড়িয়ে ধরে "চাচা অমন করে বলছেন কেন। আমি তো এ পরিবারেই একজন। আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন অনেক বড় হতে পারি।"

সবুরও পরশের পাশে বসে বলে—"আমাদের গোটা পরিবার নাহ, নাহ গোটা পরিবারই শুধু নয় সারা দেশের মানুষের আশীর্বাদ তোর উপর আছে।"

"গোটা দেশের মানুষ আমাকে কী চেনে যে গায়ে পড়ে আশীর্বাদ করবে?"

রমিজের কথায় বসার ঘরে হাসির রোল পড়ে যায়।

রমিজের গিন্নি এগিয়ে এসে বলে—অনেক আলোচনা হলো। এবার খেতে এসো। সবাই খাবারের জন্য উঠে দাঁড়ায়।

খাওয়ার পরে তিন ভাই পরশ রনি রবি নিজ ঘরে ঢুকে।

"যে কদিন এখানে আছি তোদের অঙ্ক বিজ্ঞান ইংরেজী আমি পড়াবো।"

"তুমি সত্যি সত্যি হোস্টেলে চলে যাবে?" রনি বলে। পরশ, রনি ও রবিকে জড়িয়ে ধরে বলে—ধ্যাৎ বোকা। হোষ্টেলে যাওয়ার কী দূরে চলে যাওয়া? কলেজ থেকে প্রতিদিন বিকেলে চলে আসবো। তোদের ঠিকঠাক পড়িয়ে যাবো। শুনলি না চাচা কী বললেন? চাচার কথা ফেলা যায় না।

"তবে তোমার মত জি.পি.এ পাঁচ পাব তো?"

রবির কথায় পরশ হো হো শব্দ করে বলে—ঠিক মত পড়াশোনা করলে সব অসাধ্য সাধন করা যায় বুঝলি। এখন শুয়ে পড় তো। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। কাল আবার কলেজে যেতে হবে।" ঘুম আসে না পরশের। ঝাপসা স্মৃতি গুলো ওর চোখের সামনে ভেসে উঠে। মা বাবার হাত ধরে কোলে চড়ে ঢাকা থেকে সবুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ঝাপসা মনে পড়ে একদিন রাতে নৌকায চড়ে কোথায় যেন যাবার সময় দমকা হাওয়ায় নৌকা থেকে সবাই পড়ে যায়। মাঝি সবুর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবুর সাঁতরিয়ে ডুবে পরশকে নৌকায় তুলে আনে। মা বাবার মুখ দুখানা ঝাপসা ভেসে ওঠে পরশের চোখের সামনে। কোথায় যে হারিয়ে গেল প্রিয় মা বাবা। বুকখানা জুড়ে মা বাবার স্নেহ ভরা মুখগুলো বুকের ভেতর লালন করে একটু একটু করে সবুরের স্নেহ ভালবাসায় এতো বড় হয়েছে। বাস্তব যে বড় কঠিন বাস্তবকে মেনে জীবনের সব যুদ্ধকে মোকাবেলা করেছে। ছোটবেলার মুক্তিযুদ্ধ বুঝিনি। আজ বুঝতে পারছি কত বড় যুদ্ধ এ দেশে সংগঠিত হয়েছে। মা-বাবা কী তবে মুক্তিযুদ্ধে ...। আর ভাবতে পারে না পরশ। ঢাকা শহরে পরশ আজ এখানে পরবাসী। দুচোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে পরশের। ঢাকা শহরে বাবা কী করতেন, কোথায় থাকতেন কিছু মনে পড়ছে না। ইস! কোনক্রমে ঢাকার ঠিকানাটা মনে থাকতো ... আর ভাবতে পারে না পরশ। সারাটা রাতই ছটফটিয়ে কাটে পরশের। বুকের ক্ষতটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে পরশ।

পরশ এ পাশ ওপাশ করে ভাবে বুকের এ ক্ষত নিয়েই পা দিতে হবে সামনে। আবেগের সময় নয় এখন। দুর্গম পথকে পাড়ি দিয়ে জয় করতে হবে সত্য সুন্দরকে।

ভোরের দিকে ঝাপসা স্বপ্নে দেখে পরশ। মা বাবার হাত ধরে দোলনায় দুলছে। ঘুম ভেঙ্গে যায় পরশের উঠে বসে বিছানায়। থর থর করে কাঁপছে ওর শরীর।"

"আমার মা-বাবা। দেখা দিলেন আমাকে?" চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে করে পরশের। আবার ভাবে চিৎকার করে লাভ কী? পরশ জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। ভোরের ঝিরঝিরে বাতাস ওকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। বাতাসের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওর ভেতরটা হিম শীতল হয়ে যায়। মনে হচ্ছে মা বাবার স্নেহের স্পর্শে যেন শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। মনে হচ্ছে বাবা মায়ের বুকের মাথা দিয়ে রেখেছে।

"কেন এতো সব ভাবছি আমি।" সবুর বাবা তো আমাকে বুক আগলে মানুষ করেছে। আমাকে কিছু বুঝতে দেয়নি। অথচ করেছে বলেই আজ উজ্জ্বল পথে আবার যাত্রা সবুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখ ভিজে আসে। পরশ ঘর থেকে বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে বসে। আবোল তাবোল ভাবনায় পরশ ঠাণ্ডা হাওয়াতে ও ঘামছে। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রস্তুতি নেয় পরশ। আজ অধ্যক্ষ স্যার

ডেকেছেন। কেন ডেকেছেন জানা নেই পরশের। মনে মনে প্রস্তুতি নেয় পরশ। আবার ঘরে ফিরে বিছানায় ফিরে এসে বালিশে মাথা রেখে একটু ঘুমাতে চেষ্টা করে। একটু ঘুমিয়ে ফ্রেস হয়েই অধ্যক্ষ স্যারের কাছে যাবে।

"স্যার, স্লামালাইকুম।" সালাম জানিয়ে অধ্যক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে পরশ। ফাইলে জরুরি কাজ করছিল অধ্যক্ষ। স্লামালাইকুম শুনে চোখ তুলে তাকান অধ্যক্ষ।

"তুমি এসেছো?"

"আপনি আসতে বলেছিলেন।"

অধ্যক্ষ বলেন "আমি তো একটি জরুরি ফাইল দেখছি তুমি ইতিমধ্যে কলেজের ভেতর বাইরটা ঘুরে দেখে এসো। আমি হাতের কাজটা সেরে ফেলি।"

পরশ সালাম জানিয়ে বেরিয়ে যায়। একা একা কোথায় ঘুরে বেড়াবে। ইতস্তত কলেজ করিডোর ঘুরে ক্লাস রুমগুলো ঘুরে দেখে। চোখে পড়লো কলেজ ক্যান্টিন থেকে ছাত্ররা কেউ খেয়ে বের হচ্ছে। কেউ খেতে ঢুকছে। পরশও ঢুকে পড়লো ক্যান্টিনে। সকালে তাড়াহুড়া করে ভালো করে খায়নি। চাচী কতো জোর করে খাওয়াতে চাইলেন; কিন্তু টেনশনে খেতে পারেনি।

পরশ ক্যান্টিনে ঢুকে মোটামুটি ভাল করেই খেলো। সিনিয়ার ছাত্রদের সঙ্গে সে সুবাদে আলাপচারিতাও হলো। পরশের আড়ষ্ট ভাব দেখে সিনিয়র ছাত্ররা অভয় দিয়ে বলল—

প্রথম প্রথম আমাদেরও আড়ষ্ট ভাব ছিল। এখন কলেজ চলে আমাদের দাপটে।

"দাপট কেন?"

"আমরা ছাত্র রাজনীতি করি। প্রয়োজনে কলেজে দল বেঁধে শ্লোগান দেই। ক্লাস বন্ধ করে দেই। তুমি রাজনীতি করো?"

"নাহ্ আমি রাজনীতি করি না। আমাদের স্কুলে এসব নিষিদ্ধ ছিল।"

"এ কলেজে এসেছো তো। কখন যে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে যাবে টেরই পাবে না।"

"আমি লেখাপড়া করতে এসেছি। লেখাপড়াই করবো।"

"এ রকম নুতন এলে সবাই বলে। তারপর জড়িয়ে পড়ে রাজনীতিতেই। আগে ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু করো। দেখা হবে বার বার তোমার সঙ্গে।"

কথাগুলো পরশের মোটেও ভাল লাগে না। কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে আসে ক্যান্টিন থেকে। প্রায় ঘণ্টা খানেক তো পেরিয়ে গেল। এবার অধ্যক্ষ স্যারের ঘরে যাওয়া যাক। পরশ ইতস্তত করে ধীর পায়ে ঢুকে স্যারের রুমে।

"স্লামালাইকুম স্যার।"

"ও? তুমি এসেছো?"

"জ্বি স্যার কলেজটা ঘুরে দেখলাম। সিনিয়ার ছাত্র ভাইদের অনেকের সঙ্গে আলাপও হলো।"

"আমার হাতের কাজও শেষ। চলো আমার সঙ্গে আমার বাসায়।"

"আপনার বাসায়?"

"হ্যাঁ এ-ই তো কলেজ চত্বরেই আমার বাসা, চলো। দুপুরে আমার সাথে খাবে।"

পরশ আনন্দে কাঁপছে। স্বয়ং বিখ্যাত ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের বাসায়? তাও তাঁর সঙ্গে খাওয়া?"

অধ্যক্ষ উঠে দাঁড়ায়। চলো বলেই বেরিয়ে পড়েন।

অগত্যা পরশও পিছু পিছু হাঁটে।

হাঁটতে হাঁটতে অধ্যক্ষ পরশের দিকে তাকিয়ে বলেন—"কেমন লাগছে ঢাকা শহর?"

"স্যার ঢাকা শহর আমার এ প্রথম আসা। ঘুরে দেখার সময় পেলাম কই। গ্রাম থেকে ফিরে-ই তো সোজা কলেজ—আর বাসা।"

"কার বাসা?"

"আমার চাচার বাসা।"

"তোমার চাচা কী করেন?"

"চাচার কাঠের ব্যবসা। তাছাড়া শ্রমিক লীগের যুগ্ম সম্পাদক।"

"তোমার চাচার বাসা কোথায়?"

"কাওরান বাজারে।"

"চাচা, বাবা তোমাকে খুব আদর করে বুঝি?"

"খুব খুব আদর করেন। আমাকে নিয়ে তাঁদের অনেক স্বপ্ন।"

ভাল ভাবে পড়ালেখা করো। ভাল Result করো। তবেই তাঁদের স্বপ্ন পূরণ হবে।

"চেষ্টা করবো স্যার। আমার জন্য দোয়া করবেন স্যার"। কলেজের ছাত্ররা আমার সন্তানের মতো, তুমিও। দোয়া তো সব সময়ই আছে।"

কথা বলতে বলতে দুজনেই বাসায় পৌঁছে যায়। কলেজ চত্বর থেকে অধ্যক্ষের বাসা বেশি দূরে নয়। কলিংবেল টিপতেই কাজের বুয়া দরজা খুলে দেয়। অধ্যক্ষ পরশের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি বসো। আমি কাপড় ছেড়ে হাত মুখটা ধুয়ে আসি। এই যে আমার বুক সেলফ। যেটা যেগুলো তোমার পছন্দ পড়তে চাইলে নিয়ে নিও। কিন্তু পড়া শেষে ফেরত চাই। গুরু গম্ভীর অধ্যক্ষের হাসিতে যেন মায়া ঝরে পড়লো। পরশ স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে অধ্যক্ষের দিকে। অধ্যক্ষতা খেয়াল না করে ভেতরে চলে যান।

পরশ উঠে যায় বড় বুক সেলফের দিকে, অনেক বই। থাকে থাকে স্যাজনো। অনেক মূল্যবান বই। পরশ পছন্দ মতো একটা বই হাতে নিয়ে পাতা উল্টায়। কী বই, কিসের উপর লেখা ইত্যাদি দেখে আবার জায়গায় রেখে দেয়। কত মূল্যবান বই। যা গ্রামে কোন দিন পায়নি। বই পড়া পোকা পরশের লোভ বেড়ে যায়। মনে মনে ভাবে আজ যাবার সময় স্যারকে বলে "মূলধারা" বইটি নিয়ে যাবে। মঈদুল হাসানের নাম পরশ জানে না। কিন্তু বইর পাতা উল্টিয়ে যা দেখলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। বইটা হাতে নিয়ে পরশ সোফায় বসে পাতার পর পাতা উল্টিয়ে চোখ বুলিয়ে যায়।

অধ্যক্ষ বসার ঘরে ফিরে আসেন। সঙ্গে স্ত্রী। পরশ উঠে দাঁড়ায়। অধ্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দেন—

"আমার স্ত্রী বনফুল।"

পরশ হাত তুলে সালাম জানায়।

"বস, বস। কী নাম তোমার? তোমার স্যার বললো বাসায় কলেজের ছাত্র এসেছে। চল পরিচয় করিয়ে দেবো।"

"আমার নাম পরশ"

"কোন ইয়ারে পড়ছো।"

বনফুলের প্রশ্নের পরশ একটু লজ্জা পেয়ে বলল—"এখন ও তো ভর্তিই হইনি। স্যার জানেন কবে ভর্তি হবো।"

"তোমার স্যার যখন ভর্তির আগেই স্বয়ং বাসায় নিয়ে এসেছে ভর্তি তোমার নিশ্চিত।"

"বনফুল টেবিলে খাবার দিতে বলো। পরশও খাবে।"

"নিশ্চয়ই" বনফুল উঠে যায়।

ওরা খেতে বসে। বনফুল দুজনের পাতে যত্ন সহকারে খাবার তুলে দেয়।

"আন্টি আপনি খাবেন না?"

"এ-ই তো শুরু করছি।"

পরশ বনফুলের দিকে তাকিয়ে বলে—"আপনার ছেলে মেয়েরা খাবে না ওরা?

অধ্যক্ষই উত্তর দেয়—"আমার একটিই ছেলে। আমেরিকায় পড়ালেখা করছে। ভাল স্কলারশীপি পেয়েছে। বাধা দেইনি। গোটা বাড়িতে আমরা দুজন।"

স্বয়ং অধ্যক্ষ ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে খাচ্ছে-পরশের জীবনে একটি বড় পাওয়া। নিজকে ধন্য মনে করছে এ মুহূর্তে। লজ্জা শরম দ্বিধা সংকোচে পরশ কোন প্রকারে খাওয়া শেষ করে।

"একি তোমার খাওয়া শেষ? এতো অল্প খেলে চলবে কী করে। আরো কিছু নাও।" বনফুলের কথায় লজ্জা পায় পরশ।

"সকালে চাচী জোর করে বেশি খাবার খাইয়ে দিয়েছে। তেমন ক্ষিধে নেই।"

"তোমাকে চাচী বুঝি খুব আদর করে?"

"শুধু চাচীই নয় মা-বাবা সবাই আদর করে আমাকে।"

মৃদু একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে পরশ।

অধ্যক্ষ তা খেয়াল করে।

"তোমার মতো ছেলেকে আদর করবে না? সেকি হয়?" তোমার এ স্যার কোনদিন কোন ছাত্রকে এভাবে ডেকে এনে এক সঙ্গে খায়নি। ছাত্ররা কখনও প্রয়োজনে আসে। ২/১ কথা বলে চলে যায়।

"এ আমার পরম সৌভাগ্য" পরশ এবারও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কথাটা বলে।"

চলো পরশ আমরা বসার ঘরে বসি। দুজনে উঠে যায় বসার ঘরের দিকে। অধ্যক্ষ সিগারেট ধরাতে ধরাতে পরশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। পরশ মাথা নিচু করে বসে থাকলেও তা বুঝতে পারে। নীরবতায় কাটে অনেকক্ষণ। পরশের বুকটা ধক ধক করছে। মনে মনে ভাবে কেন স্যার আমাকে এভাবে নিয়ে এলেন।

"তোমার নাম পরশ। ভাল নাম কী?"

অধ্যক্ষের প্রশ্নের পরশ ছোট করে উত্তর দেয়। "পরশ ইবনে মাহমুদ।"

কে রেখেছে এ নাম?

"পরশ নামটা তো জন্মের পর থকেই শুনে আসছি। স্কুলে ভর্তির সময় বাবাই প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করে ইবনে মাহমুদ জুড়িয়ে দিলেন।"

"গ্রামের ছেলেদের নাম রাখে বাবা মা অন্য রকম। এ নাম একেবারে শহরে শিক্ষিত পরিবারে নাম। তোমার বাবা আধুনিক মনস্কের লোক।"

"বাবা আমাকে গ্রামের অন্য ছেলেদের চাইতে একটু ভিন্নভাবে মানুষ করতে চেয়েছেন।"

"তা ... গ্রাম ছেড়ে আসতে তোমার খারাপ লাগেনি তো?"

"না? ঢাকার প্রতি বরাবরই আমার ভিন্ন আকর্ষণ কাজ করেছে। ভাল ফলের সুবাদেই ঢাকা আসতে পারলাম। সঙ্গে পেলাম আপনার মতো একজন মহৎ ব্যক্তিকে এ আমার পরম সৌভাগ্য।"

"এটি তোমার কাজের প্রাপ্তি।"

"ইন্টারে কেমন Result করবো তবেই বুঝতে পারবো আমার প্রাপ্তি।"

"তা ... কলেজে ভর্তি হয়ে কোথায় থাকবে? চাচার বাসায়? নাকি হোস্টেলে?"

স্যার আপনি আমার বড় অভিভাবক এখন। আপনি আমায় যা বলবেন তাই করবো।

"তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে লেখাপড়া ছাড়া তোমার মাথায় কিছু নেই। ঢাকার হালচাল অন্য রকম। রাজনৈতিক অস্থিরতা তো আছেই। তার মধ্যে কলেজে ছাত্র রাজনীতি। সব কলেজেই।"

"স্যার এসব ব্যাপার থেকে আমি দূরে সরে থাকতে চাই।"

"চাইলেও কী পারবে? কখন যে জড়িয়ে পড়বে তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না। তুমি রাজনীতি নিয়ে ভাব না?"

"মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতি আমার বিশ্বাসের স্থান। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করেই বড় হবো স্যার।"

"মুক্তিযুদ্ধ তো তুমি দেখনি।"

"নাহ্ স্যার"।

"তোমার বাপ চাচারা তো মুক্তিযোদ্ধা ছিল।"

"জ্বি স্যার।"

"পরশ বেশ আবেগ প্রবণ হয়ে বলে "আমি আমাকে স্বাধীনতার সন্তান মনে করি।"

অধ্যক্ষ বুঝতে পারলেন পরশের ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন—

"দেখো পরশ আামর একমাত্র ছেলে থাকে বাইরে। গোটা বাড়িতে আমরা দুজন। তোমার মতো সৎ নিষ্ঠাবান ছেলেকে দেখে মনে হলো হোস্টেলে না থেকে তুমি আমার বাসায় থাকো। আমার স্ত্রী অসম্ভব ভালো। আমার অভিভাবকত্বে সামনে আলোর পথে পা বাড়াও তা আমি মনে প্রাণে চাই। জীবনের এক বাঁক থেকে আরেক কঠিন বাঁকে তোমার যাত্রা শুরু। তোমার বাবা থাকেন গ্রামে। চাচা আছেন ঢাকায় তা জানি। আমার আরেকটি ছেলে থাকলে সেও তো আমার কাছে থাকতো। তুমি পড়ালেখার পরিবেশে আমার তত্ত্বাবধানে সেরা Result করো সেটিই আমি চাই।"

পরশ নখ খুটে খাচ্ছে, ভাবছে। অধ্যক্ষ খেয়াল করে। "কী ভাবছো?" অধ্যক্ষের প্রশ্ন।

"স্যার আমার ভেতরের ঝড়ো হাওয়া শুধু আমাকেই ওলটপালট করে দেয়। কাউকেই কোনদিন কিছু বুঝতে দেইনি।"

"তোমার মা-বাবাকেও নয়?"

"মা বাবা? ... বুক চেরা দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা অধ্যক্ষের কানে আসে।

"দেখো তোমার সঙ্গে তো সবে দেখা। তোমার ভেতরে চাপা কোন কষ্ট তুমি লালন করছো। কী সেটা আমি জানি না। যদি কোন দিন মনে হয় বলো আমাকে। আগে ভর্তি হও। আমার প্রস্তাবটা তোমার বাবা চাচাকে জানিও। আমার মনে হয় না তারা দ্বিমত করবেন। ভর্তির পরে তোমার বাবাকে নিয়ে অফিসে এসো একদিন। এই নাও খামটা রাখো। এটি আমার আশীর্বাদ।"

"কী আছে তাতে?"

সামান্য কিছু টাকা। বললাম তো আমার ছেলে থাকে বিদেশে। টাকা পয়সা পাঠাতে হয় না। অন্তত ভাল কাজে আমার কিছু টাকা খরচ হলো। নাও ধর, ধর বলছি।" পরশ কম্পিত হাতে খামটা নেয় আর অমনি বনফুল ঘরে ঢুকে।

"খুব গল্প হচ্ছে নাহ্?"

অধ্যক্ষ পরশের হাত খানা নিজের হাতে তুলে বলেন "জানো বনফুল পরশকে আমাদের বাসায় থেকে পড়ালেখার কথা বলেছি।"

"খুব ভাল করেছো। এমন ছেলে! খুব লক্ষ্মী। পরশ লাভটা হবে আমার। পরশের সঙ্গে বিভিন্ন বই উপন্যাস নিয়ে অবসরে আলোচনা করতে পারবো। পরশ তুমি থাকবে কিন্তু। তোমার বাবা চাচাকে নিয়ে এসো একদিন।"

পরশ মাথা নিচু করে বসেই আছে।

আপাতত আমার যা বলার বলেছি। ওকেও ভাবতে হবে। চলো পরশ কলেজের দিকে যাই।

জ্বী স্যার বলেই বনফুলের পা ধরে সালাম করে বলে "ভর্তি হয়ে আবার স্যারের সাথে আসবো।"

স্যারের সঙ্গে কেন? একা আসা যায় না?"

বনফুলের কথায় পরশ হাসে।

অধ্যক্ষ ও পরশ বেরিয়ে যায়। পেছন থেকে বলে "আবার এসো।"

ঘরে ঢুকতেই রনি, রবি চেঁচিয়ে উঠে।

"এই তো পরশ ভাইয়া এসে গেছে। আজ দুপুর থেকে জেঠু মা তোমার ফেরার দেরী থেকে কি যে চিন্তায় ছিল।"

"চিন্তা কিসের? আমি তো বলেই কলেজে গেছি। কলেজে আমার অনেক কাজ ছিল। অধ্যক্ষ স্যারের সঙ্গে কিছু কথা ছিল। স্যার আবার আমাকে নিয়ে তাঁর বাসায় গেলেন। স্যারের সঙ্গে খেলাম। খাওয়ার পর বসার ঘরে বসে অনেক আলাপ হলো। স্যারের স্ত্রী খুব ভাল মানুষ। কী যত্ন করে খাওয়ালো আমাকে। এ জন্যই দেরী হলো। আমি কী কচি খোকা? হারিয়ে যাবো। তোরাও পারিস। "বাবা কোথায় রে?"

"বাবার দোকানে গেছে।" রনি বলে।

"আমিও দোকান থেকে ঘুরে আসি।"

"আমরাও যাবো"। রনি, রবি উৎসাহের সাথে বলে।

"চল যাই।"

তিন ভাই এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। পেছন থেকে রমিজের স্ত্রী চেঁচিয়ে বলে।

"কোথায যাচ্ছিস তোরা। কিছু খেয়ে যা তোরা।"

ইতিমধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়েছে। রিক্সায় যেতে যেতে তিনজনই রাজ্যের গল্প।

"পরশ ভাইয়াকে আজ খুব খুশি খুশি লাগছে। কী বলো রনি ভাইজান?"

স্বয়ং অধ্যক্ষের বাসায মজাদার খাওয়া খেলে যা হয়। মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। কলেজে ভর্তি না হতেই স্বয়ং অধ্যক্ষের বসার ঘরে। এটি কম আনন্দ আর গর্বের ব্যাপার। ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিস পরশ ভাইয়া।"

তিনজনই দোকানে ঢুকে দেখতে পায় সবুর রমিজ দুজনে পরশের ব্যাপারেই আলোচনা করছে।

কিরে কখন ফিরলি? সবুর প্রশ্ন করে।

"ঘণ্টা খানেক। বাসায় গেলাম। ওদের নিয়ে বাসা থেকেই দোকানে চলে এলাম।"

"তা ... স্যারের সঙ্গে দেখা হলো?"

"হ্যাঁ।"

"কী বললেন তিনি?"

"অসম্ভব ভাল মানুষ উনি।"

পরশ এক এক করে সব বলে। শুধু বলে না স্যারের বাসায় থাকার প্রস্তাবটির কথা পরশ ভাবে সময় বুঝে বাবাকেই বলবে।

"স্বয়ং অধ্যক্ষ স্যারের বাসায় গেলি আর খেলি? উনি এতো ভাল মানুষ প্রথম দিন দেখেই বুঝেছি।"

সবুরের কথায় পরশ গর্বের সঙ্গে বলে—

"এমন সোনার মানুষ তিনি বাবা যতো কথা বলেছি তত মুগ্ধ হয়েছি।"

টাকার খামটা ইচ্ছে করেই দেখায়নি। রাতে একান্তে পেলে দেখাবে।

রমিজ আদর মাখা কণ্ঠে কাছে ডাকে পরশকে।

"তোর কাছ থেকে কথা গুলো শুনে খুব তৃপ্তি পেলাম। নিশ্চিত হলাম—একজন ভাল মানুষের তত্ত্বাবধানে তুই থাকবি। ভর্তিটা কবে?"

"চাচা আর চারদিন পরই ভর্তির সুযোগ পাওয়াদের নাম বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবে। দোয়া করো চাচা।"

পরশের পিঠে মৃদু থাপ্পড় দিয়ে রমিজ বলে—"বোকা ছেলে দোয়া করবো না? কী খাবি বল।"

"না চাচা কিছু খাবো না। একটু পরেই তো বাসায় যাবো। চাচীর হাতের মজাদার রান্না খাবো।"

রমিজ দ্রুত নিজের কাজে মন দেয়। ক্যাশ বাক্স খুলে সব বুঝে নেয়। কর্মচারীদের ডেকে বলে সব গুছিয়ে দোকান বন্ধ করে দিতে।

বাসায় ফিরে পরশ গোসলটা সেরে নেয়। গোসল সেরে এসে বসে বসার ঘরে। টিভি দেখায় মন দেয়। সবুর পিঠে হাত রাখে।

"খুব ভাল সময় কেটেছে আজ তোর। স্বয়ং স্যারের বাসায় গেলি। তার সঙ্গে খেলি। সবই উপরওয়ালার ইচ্ছেরে। জীবনের সব দরজা এক সঙ্গে বন্ধ হয় না। একটা দুটো দরজা খোলা থাকেই। সে দরজা দিয়েই সব আলো ঠিক পড়ে। পথের দ্যাখা মানুষ এ ভাবেই পায়রে। তুই ও পাবি।"

"বাবা।" পরশ ডাকে আদর মাখা কণ্ঠে।

"কিছু বলবে বাবা?"

"কাল নাস্তা খেয়ে তোমাকে নিয়ে বের হবো?"

"কোথায়?"

"আগে চলো তারপর দেখবে।"

আচ্ছা বাবা।

রাতের খাবার খেয়ে পরশ শুয়ে পড়ে। অন্যদিন খাওয়ার পর ঘরে ফিরে তিন ভাই চুটিয়ে আড্ডা মারে। পরশ ভাবে রনি, রবির পড়ার বিঘ্ন ঘটছে। সন্ধ্যায় আড্ডার জন্য ওদের স্কুলের পড়াও ঠিক মত হচ্ছে না।

"কী পরশ ভাইয়া তুমি শুয়ে পড়লে?"

ভীষণ ঘুম পেয়েছেরে আজ। তোরা স্কুলের পড়া শেষ করেছিস?"

"কিছু বাকি আছে। শেষ করে ফেলবো। তুমি তো বলেছিলে "আমাদের অঙ্কটা দেখিয়ে দেবে।"

অঙ্ক করিসনি? দেখি আয় অঙ্কটা পড়িয়ে দেই। কলেজে ভর্তির পর তোদের অঙ্ক আমিই পড়াবো।"

নাহ্ থাক তুমি ঘুমাও আজ। কাল সন্ধ্যায় তোমাকে নিয়ে বসব। এখন থেকে তুমিই আমাদের অঙ্কটা দেখিয়ে দিও। আমরা বরং বাকি পড়াগুলো সেরে ফেলি। দাঁড়াও তোমার মাথার কাছের বাতিটা নিভিয়ে দেই। আরাম করে ঘুমাও তুমি।"

বাসা থেকে বাপ ব্যাটা বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে। "কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

"চলো বাবা তোমাকে শহীদ মিনারটা দেখাই। মুক্তিযোদ্ধা সবুর মোল্লা ঢাকা শহরে এসে শহীদ মিনার দেখবে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৩২ নাম্বার বাড়িটা দেখবে না তা কী করে হয়।" বুক চেরা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে সবুরের বুক চিরে।

"মুক্তিযোদ্ধা সেই কবেকার কথা মুক্তিযোদ্ধা সারা দেশে কজন সার্টিফিকেট পেয়েছে? আমি তো কোন ছার। শুধু বুকে পুষেই রাখছি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে নিয়ে '৭১ এ জীবন বাজি রেখে কাজ করেছি। আমার মত সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের কে মনে রেখেছে।"

"ঠিক বলেছো বাবা। দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রামের নিঝুম পল্লীতে এ গর্ব নিয়েই বেঁচে থাকতে হচ্ছে। আর অন্য দিকে রাজাকার আল বদররা বুক ফুলিয়ে চলছে। এ কষ্ট কী আমার হয় না বাবার চাচা আর তোমার জন্য আমার ভীষণ গর্ব হয় বাবা।"

একটা রিক্সা নিয়ে ওরা শহীদ মিনারে পৌঁছে যায়। দুজনে শহীদ মিনারের পাদদেশে মাথা নীচু করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। সিঁড়িতে বসে বাপ ব্যাটা।

"এখান থেকে ৩২ নাম্বার বঙ্গবন্ধুর বাড়ি যাবো। ফেরার পথে দুজনে বাইরে খাবো।"

"আগে বলবিনে? পকেটে যে অত টাকা নিয়ে আসিনি।"

"আমার কাছে আছে।"

"তোর কাছে এতো টাকা কোথা থেকে? রমিজ দিয়েছে বুঝি?"

"নাহ্ বাবা চাচা দেয়নি।"

পরশ সব কথা খুলে বলে। স্যার যে বাসায় থাকার কথা বলেছে—তাও বলে। খামে পাঁচ হাজার টাকা দেবার কথাও। স্যারের স্ত্রী বনফুল যে কী ভাল মানুষ পরশ উচ্ছ্বাসের সাথে বলে যায়।

সবুর চুপ করে কথাগুলো শোনে।

"বাবা কথা বলছো না কেন? আমি কী করবো?"

"আমাকে একটু ভাবতে দে। স্যার তো আন্তরিকভাবেই কথা গুলো বলেছেন। তুই আগে ভর্তি হয়ে নে। সময় বুঝে স্যারকে বলে আমি তুই মিলেই দেখা করে কথা বলবো। টাকাগুলো ভালবেসে দিয়েছেন। সাবধানে রাখিস। এ টাকা দিয়েই ভর্তি হবি তুই। আশীর্বাদের টাকা। স্যার যে খুব ভাল মানুষ প্রথম দিন দেখেই বুঝতে পেরেছি। দেখ পরশ পথ চলতে চলতে আলো এসে পড়লো তোর চলার পথে। চল উঠি জাতির পিতার বাড়ি যাই।"

শহীদ মিনারের সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে আসতেই একটা সি.এন.জি পেয়ে যায়। ওরা উঠে পড়ে। সি.এন.জি ড্রাইভারকে পরশ বলে ধানমন্ডি ৩২ নাম্বার। "বঙ্গবন্ধুর বাড়ি? ঠিক আছে।"

পরশ খেয়াল করে ড্রাইভারের মুখে গর্বের হাসি।

ড্রাইভার ঠিক বঙ্গবন্ধুর বাড়ির মহান নেতার ছবির সামনে থামে। বাপ-বেটা নেমে পড়ে সি.এন.জি থেকে। বীর পায়ে এগিয়ে যায় বিশাল ছবিটির সামনে। হাঁটু গেড়ে বসে দুজনে ছবির সামনে। সবুর হুহু করে কেঁদে উঠে। চিৎকার করে বলে "হে মহান নেতা তুমিই দিয়েছো স্বাধীনতা। তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বই নেতা। তোমাকে সামনাসামনি কোনদিন দেখিনি। কিন্তু তোমার ছবি বুকের ভেতর জ্বলজ্বলে জ্বলে। এই সোনার ছেলে পরশকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। সত্য উদঘাটনে ওকে সাহায্য করো। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে যেন বড় হতে পারে। তোমার পায়ে ওকে সমর্পণ করে গেলাম। পিতা।"

পরশ মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে বলে "হে পিতা তোমার আদর্শে যেন বড় হতে পারি। আমি যা হারিয়েছি তা যেন খুঁজে পাই।"

দুজনে উঠে দাঁড়ায়। ধীর পায়ে উঠে বসে সি.এন.জি তে। "কোথায় যাবেন স্যার?" ড্রাইভার জানতে চায়।

সামনে কোন একটা রেস্টুরেন্টে নামিয়ে দাও।

"ঠিক আছে স্যার।"

একটা রেস্টুরেন্টে নামিয়ে দেয় ওদের ড্রাইভার।

অচেনা জায়গা, অচেনা রেস্টুরেন্ট। জীবনে কোনদিন এমন জায়গায় আসেনি।

রেস্টুরেন্টে তো এল। কিন্তু কিভাবে অর্ডার দেবে কী দেবে পরশ চেয়ার টেনে বসে। বাবাকেও বসতে বলে। ওয়েটার মেনুটা নিয়ে সামনে দাঁড়ায়। পরশ মেনু দেখে তাড়াতাড়ি চেনা খাবার গুলো অর্ডার দেয়। খাবার খেতে খেতে পরশ বলে।

"বাবা যাওয়ার সময় সংসদ ভবনটা দেখিয়ে নিয়ে যাবো।"

"তুই যখন ঢাকা এসেছিস। ঢাকায় আসা তো প্রায়ই হবে। আরো কত কী যে দেখবো তোকেও দেখবো দুই আস্তে আস্তে কত বড় হচ্ছিস। সেদিনটির জন্যই আমার অপেক্ষা।"

রেস্টুরেন্ট থেকে একটা সি.এন.জি ডেকে দুজনে উঠে পড়ে।

"চলো সংসদ ভবনের সামনে।"

"জ্বী স্যার।"

সি.এন.জি এসে থামে সংসদ ভবনের সামনে। ওরা দুজনেই নেমে সংসদ ভবনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। ঘুরে ঘুরে দেখে সংসদ ভবন। আনন্দে সবুর চিৎকার করে বলে—"জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।"

অসংখ্য মানুষ সংসদ ভবনের সামনে। পরশ আনমনা হয়ে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের সংসদ ভবন। সাধের স্বাধীনতার জন্য কত রক্ত! কত লাশ! কতো মায়ের ছেলে হারানো কত বোনের স্বামী হারানো। কত সন্তান মা-বাবা হারানো। পরশ নিজের দিকে তাকায়—মনে মনে বলে আর আমি? বুক ছেঁড়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বিশাল সংসদ ভবনের দিকে তাকিয়ে বলে সত্যটা জানিয়ে দাও হে সংসদ ভবন। চোখটা ভিজে যায় ওর। পাছে সুবর দেখে ফেলে দূরে সরে যায় পরশ। আনমনা হাঁটতে থাকে। ভেতরে ওর ঝড় বয়ে চলছে। ওর ভেতরের কষ্টের কথা কোনদিন সবুর বা কাউকেই জানতে দেয়নি।

গড়িয়ে যায় সময়। সময় গড়িয়ে যায়। সবুর আনন্দে সংসদ ভবন ঘুরে ঘুরে দেখে। বিকেল হয়ে গেল। পরশ সবুরের কাঁধে হাত রেখে বলে—"চলো বাবা বাসায় ফিরি।"

"হ্যাঁ চল। অনেক ভাল ভাল জায়গা দেখিয়েছিস আজ বাবা। তুই অনেক বড় 'হ' বাবা।"

বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। "কোথায় গিয়েছিলে বাপ বেটা মিলে? রমিজ গিন্নি হাসতে হাসতে বললো।"

"ছেলে আমাকে ঢাকা শহরটা ঘুরে দেখালো ভাবী। খুব ভাল লাগলো।"

"সারাদিন কিছু খেয়েছেন ভাইজান?"

"হ্যাঁ পরশ রাস্তায় খাওয়ালো।"

"চা দেবো ভাইজান?"

"হ্যাঁ দাও।"

রনি, রবি ছুটে আসে ঘর থেকে। "আমরা গেলাম স্কুলে। এ ফাঁকে তোমরা তো বেশ ঘুরে এলে।"

"আরে ঢাকা শহরেই তো থাকবো। তোদের নিয়েই তো ঘুরবো ভর্তির পরে বাবা চলে যাবেন। ভাবলাম বাবাকে নিয়ে তাই একটু ঘুরে এলাম।"

"তুমি আজ আমাদের অঙ্ক দেখিয়ে দেবে কিন্তু।"

"চা খেয়েই আসছি। তোরা অঙ্ক বই নিয়ে বস।"

চাচী ও চাচী চা দাও না বলতে বলতে একেবারে রান্না ঘরেই চলে যায়।

"একি চাচী সমূচা করার কী দরকার। শুধু চা হলেই হবে।"

রনি, রবি রুহিনকে দিয়েছি। এ কয়টা তোদের জন্য রাখলাম। তোর চাচা তো দোকান থেকে এসে কিছু খায় না। একেবারে ভাত খায়।

"দাও আমার কাছে দাও। আমিই নিয়ে যাই।"

পরশ চাচীসহ বসার ঘরে ফিরে আসে। চেঁচিয়ে ডাকে পরশ, রনি, রবি, রুহিনকে। বসার ঘর জমে উঠে।

"পরশ ভাইয়া আমাকেও তুমি কিন্তু একদিন বাইরে নিয়ে যাবে।"

"যাবো যাবো আমরা তিন ভাই তোকে নিয়ে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াবো। আগে ভর্তিটা হয়ে যাক। রনি, রবি তোরা ঘরে যা তোদের অঙ্ক দেখবো। যা যা বলছি।" পরশ ও পিছু পিছু যায়।

"তা ভাইজান পরশকে সত্যিই খুব ভাল করে মানুষ করেছেন। রনি, রবি তেমন হবে তো?"

"হবে হবে। পরশ যখন আছে পরশের দেখাদেখি দেখো ওরা ঠিক মত পড়ালেখা করবে। তুমি কোন চিন্তা করো না।"

"দিন কাল যা খারাপ। কখন কার সঙ্গে মিশে। কোথায় যায়। ঘরে বসে তা জানবার উপায় নেই। ওদের বাবা তো দোকান আর শ্রমিক লীগ নিয়েই থাকে। পরশ ভর্তি হউক। ক্লাস শুরু হউক। পরশকেই আমি রনি, রবির প্রাইভেট টিউটর করে রাখবো। পরশের ভয়ে ওরা স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফিরবে। ঠিক বলছি না ভাইজান?"

"তুমি এসব নিয়ে কিছু ভেব না। দেখছো না কেমন নিশ্চিন্তে পরশকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। অপুটা একা একা কী করছে জানি না। গ্রামে ফিরে অপুর দিকে নজর দিতে হবে। ছেলেটা ব্যবসাপাতি ভাল না করলে বিয়ে থা করাবে কী ভাবে।"

"অপুর বিয়ের কথা এখন মোটেও ভাববেন না। আগে আরো শক্ত পায়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক। এর আগে নয়।"

"হ্যাঁ আমিও তা-ই ভাবি। কিন্তু মুসকিল কী জান? তোমার ভাবীজান একা একা ঘরে বৌ আসলে ওর ভাল সময় কাটবে।"

"যতটা পারেন আপনি-ই ভাবীজানকে সময় দেবেন। পরের বার আসার সময় ভাবীকেও নিয়ে আসবেন।"

"তোমার ভাবীকে আনলে ঐ যে অপু? সে-তো গোটা বাড়িতে একদম একা। সমস্যা আর সমস্যা!"

"কিসের সমস্যা ভাইজান। নতুন করে কিছু হলো?" রমিজ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে।

"নাহ্ অপুর কথা বলছিলাম।এবার বাড়ি ফিরে অপুর দিকে একটু নজর দিতে হবে।"

"ঠিক-ই বলেছেন ভাইজান এতটি বছর আপনি একাই পরশকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এ ব্যস্ততার ফলও পরশ আপনাকে দিয়েছে অমন মহৎ কাজ কজনে করে।"

"মহৎ নয় কর্তব্য। মুক্তিযুদ্ধের কাছে আমরা ঋণী। মুক্তিযুদ্ধের ফসল-ই তো পরশ। এটুকু না করলে কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিস? আর আমি?"

সবুর পরশকে নিয়ে চলে গেল ঢাকা কলেজে। আজ বোর্ডে নাম ঝুলিয়ে দেবে। সারা পথে আল্লাহ্‌কে ডাকতে ডাকতে ঢাকা কলেজে ঢুকে সোজা চলে গেল বোর্ডের কাছে। অসংখ্য ছাত্র বোর্ডের সামনে। "এতো ভিড় কী করে যাই বাবা।"

"ভিড় ঠেলে ঢুকে পড় না। অন্যরা যেমন করছে।" সবুরের কথা শোনে না পরশ। ভাবে যারা তাদের নাম দেখবে না তারা সরে পড়বে। ভিড়ও কমতে থাকবে। তারপর পরশ যাবে। সত্যিই অনেকেই মুখ কালো করে সরে পড়ে। চোখে তাদের পানি। তবুও বোর্ডের সামনে যথেষ্ট ভিড়। এবার পরশ সাহস করে ভিড় ঠেলে বোর্ডের সামনে চলে যায়। এক নাম্বার, দুই নাম্বার সিরিয়েল দেখে মনটা খারাপ হয়ে যায়। নাহ্ হাল ছাড়লে চলবে না। তিন থেকে বাকি সব দেখতে হবে। পরশ ভর্তির সুযোগ পাবে না—তা হতে পারে না। স্যার নিজে দরখাস্ত সুপারিশ করেছে।

পরশ আবার বোর্ডে চোখ রাখে। এক নাম্বার, দুই নাম্বার সিরিয়েল শেষে তিন নাম্বারে চোখ পড়তেই চমকে উঠে পরশ। বড় বড় টাইপে লেখা "পরশ ইবনে মাহ্‌মুদ!!! ভেতরটা পরশের আনন্দে নেচে উঠে। তিন নাম্বারের সিরিয়েল নাম্বারটা ঝটপট এক টুকরো কাগজে টুকে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে সবুরকে জড়িয়ে ধরে।

"বাবা আমার নাম তিন নাম্বারে। তিন নাম্বারের সিরিয়েল দ্যাখো বাবা। বাবা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এতে বড়ো দুর্লভ সুযোগ আমি পেয়েছি।" সবুরের পা ছুয়ে সালাম করে সবুরকে জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে উঠে। সবুরও পরশকে দুহাতে বুকে চেপে বলে—

"কাঁদছিস কেন—এতো তোর আজ আনন্দের দিন। পরশকে সান্ত্বনা দেয়।"

ওরা সিরিয়েল নাম্বারটা নিয়ে অফিস ঘরে যায়। "আজ কী ভর্তি হতে পারি?" পরশ জানতে চায়।

"হ্যাঁ চাইলে আজই হতে পারেন।"

ভর্তি ফরমটা নিয়ে সাবধানে পূরণ করে প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে পরশও সবুর অপেক্ষা করে। আজ ভর্তির ভিড়টা কম বলে তাড়াতাড়িই হয়ে যায়। অফিসের হেড ক্লার্ক পরশকে ডেকে ভর্তির স্লিপটা দিয়ে বলে—"আপনার রোল এক। সেকশন-A।

"কবে ক্লাস শুরু হবে?"

সময় মত বোর্ডে নোটিশ দেয়া হবে।

ওরা বেরিয়ে পড়ে অফিস ঘর থেকে। দাঁড়ায় এসে অধ্যক্ষ স্যারের রুমের সামনে। পরশ উঁকি মেরে দেখে স্যারের ঘরে অনেক লোক। এখন উপায়? স্যারকে সালাম করে ভর্তির খবরটা দিবেই এবং আজই। পরশ ভাবে এ ফাঁকে ক্যান্টিন থেকে কিছু খেয়ে আসা যাক।

"বাবা চলো।। কলেজের ক্যান্টিনটা ঘুরে আসি।"

"এ ফাঁকে যদি স্যার বেরিয়ে যায়?" সবুরের কথায় পরশ হেসে বলে আজ ভর্তির দিন স্যার যাবে না। চলতো ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে আসি।

"চল।"

ক্যান্টিনে অনেকক্ষণ কাটিয়ে বাপ ব্যটা আবার ফিরে অধ্যক্ষ স্যারের রুমের সামনে। লোকের ভিড় কমে গেছে। দুজনে অপেক্ষা করে ঘরের সামনে।

"ক্যান্টিনে অনেক খাওয়ালে বাবা।"

"সবুরের কথায় পরশও বলে খুশির চোটে আমিও খেলাম।"

অধ্যক্ষ স্যার বাসায় যাবার জন্য ঘর থেকে বের হতেই পরশ ছুটে এসে পা ধরে সালাম করে বলে "স্যার আজ ভর্তি হয়েছি। আপনাকে সালাম করার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

সবুরও এগিয়ে এসে সালাম জানায়।

"ভর্তির কাজটা সেরে নিয়েছ—ভালই করছো।"

"বাবা তো গ্রামে চলে যাবেন তাই কাজটা আজই করলাম।"

"পরশু দিন শুক্রবার বিকেলে তোমার বাবাকে নিয়ে বাসায় এসো।"

"জ্বি স্যার।"

অধ্যক্ষ স্মিত হেসে চলে যান।

"স্যারের সঙ্গে দেখা হলো। একটা বড় কাজ হয়ে গেল।"

পরশ সবুরকে জড়িয়ে ধরে।

"তোর স্যার আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বলেছে! উঃ আমার কিযে আনন্দ লাগছে।"

"চল বাবা বাসায় যাই।"

"কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে যাই বাসার জন্য।"

"হ্যাঁ চলো।"

নিউ মার্কেটে এদিক সেদিক ঘুরে বাসায় ফিরতে ফিরতে বিকেল। পরশের ভর্তির খবর শুনে বাসায় হৈ চৈ পড়ে যায়। ভর্তির কাগজ খানা রনি, রবি বার বার দেখে। সেকশন 'এ' রোল এক।

পরশ ভাইয়া তুমি দেখালে বটে।

রনি বাবাকে মোবাইলে খবরটা জানায়। রমিজও খুব খুশি হয় বলে তোর মাকে ভাল কিছু রান্না করতে বল। বাসায় ফিরে সবাই এক সঙ্গে খাবো রাতে।

রনি কানে কানে পরশকে বলে "কাল আমরা তিনজন বের হবো। বাইরে খাওয়াতে হবে কিন্তু।" পরশ চোখের ইশারায় হ্যাঁ বলে। রমিজের বৌ রান্না ঘরে রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সবুর বার বার দেয়াল ঘড়ি দেখে আর ভাবে উঃ রমিজ কেন আসছে না। আনন্দ প্রকাশের জায়গাটা তো রমিজই। টিভি দেখায়ও মন বসছে না। সবুর উঠে যায় ঘরের বাইরে।

"জেঠা কোথায় যাচ্ছেন?" রুহিনের প্রশ্নের ওকে আদর করে "এই তো বাসার বাইরে একটু ঘুরে আসি।" সবুর ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় পায়চারি করে। রাজ্যের চিন্তা ওর মাথায় ঘুরপাক খায়। পরশের একটা গতি হয়েছে। সবুরের জন্য তা গর্বের, আনন্দের। কিন্তু অপু? সেও তো এমনি করে ঢাকা কলেজ বা অন্য যেকোন কলেজে পড়তে পারতো। কিন্তু অপু বরাবরই লেখাপড়ায় অমনযোগী ছিল। যে কোন অজুহাতে স্কুল কামাই করে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরতো। সবুর ঘরে ফিরলে স্ত্রী নালিশ দিতো। ততক্ষণে অপু ঘুম। আর পরশ

তখন ও হারিকেনের আলোয় পড়ার টেবিলে। সারাদিন নৌকা চালিয়ে এতো ক্লান্ত হয়ে ফিরতো। অপুকে কিছু বলার সুযোগও পেত না। দিনের বেলা যদি কখনও অপুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো ডেকে বলতো "পড়ালেখাটা ভাল করে কর বাবা। পড়ালেখা করে অনেক বড় হবি। চাকরি করবি। পরশ কত মন দিয়ে পড়ালেখা করছে তোর চোখের সামনেই।"

মেট্রিকটা কোন ক্রমে পাশ করলো অপু।

"এখন কী করবি?"

সবুরের কথায় অপু আহ্লাদে বলে—"বাবা নৌকা আর কত দিন চালাবে। কত দিন কষ্ট করবে। বাজারে একটা দোকান খালি আছে। মালিককে বলে কয়ে দোকানটা ভাড়া নিয়ে দাও। একটা মুদি দোকান খুলি। এতেই আমার আগ্রহ বেশি। দুটো পয়সা রোজগার তো করতে পারবো। দেবে বাবা। আমি আর পড়তে চাই না। টাকা রোজগার করবো। পরশ ভাল ছাত্র। দেখবে মেট্রিকে ভাল রেজাল্ট করবে। ওর দিকে আমাদের মন দিতে হবে।"

সেই যে অপুকে কষ্ট করে দোকানটা করে দিলো-ভালই করছে। পায়চারি করতে করতে এসব ভাবনা গুলো সবুরকে অস্থির করে তোলে। ধীর পায়ে ঘরে ফিরে আসে সবুর। ঘরে ঢুকেই রমিজকে দেখতে পায়। রমিজের হাত খানা উচ্ছ্বাসে চেপে বলে—"পরশ আজ ভর্তি হয়েছে।"

"আমি শুনেছি। আমাকে সালাম করে সুখবরটা দিলো। বিরাট একটা চিন্তা দূর হলো। পরশকে বুক আগলে রেখেছো। এখন আমার কাছে আছে। ওকে আমিই দেখবো। চিন্তা করো না ভাইজান।"

"তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম পরশকে। সেদিনের সে ছোট মুখখানা আজ বার বার মনে পড়ছে।" আমার ও মনে পড়ে পরশের কচি মুখখানা। কী জানি ওর কিছু মনে আছে কিনা যাগগে। এখন ওর আলোর পথ। আমরা সবাই ওর সঙ্গে আছি। চলো সবাই মিলে খেতে যাই। তোমার ভাবী অপেক্ষা করছে।"

"তা বাবা পরশ ক্লাস কবে থেকে শুরু হবে?"

"আগামী মাসের দুই তারিখ থেকে।"

মানসিক প্রস্তুতি নাও। ভর্তির পরে কোথায় থাকবে। নাকি আমার বাসায় ঠিক করে নিও।"

"ফরম পূরণের সময় তো হোস্টেল লিখেছি।"

"হোস্টেলে থাকো-বা বাসায় থাকবে তা তুমিই ঠিক করবে। রনি রবিকে কিন্তু অঙ্ক বিজ্ঞানটা পড়িও।"

"সে আমি দেখবো চাচা। চিন্তা করবেন না আপনি। আমিও চাই ওরা মেট্রিকে ভাল করুক।

"হ্যাঁ বাবা পরশ ভাই আমাদের দেখবে। পরশ ভাই ইতিমধ্যে আমাদের নিয়ে বসে। তুমি চিন্তা করো না ওসব।" রনি, রবি এক সঙ্গেই কথাটা বলে।

খেতে খেতে সবার সামনেই বলে—

"কাল বিকেলে কিন্তু আমরা বের হচ্ছি। ঠিক আছে তো?" "যাবো যাবো একশত বার যাবো।"

খাওয়ার টেবিলে জমিয়ে আড্ডা মেরে সবুর রমিজ, বসার ঘরে ফিরে আসে। আর তিন ভাই নিজ ঘরে ফিরে যায়। দরজাটা বন্ধ করে পরশ উল্লাসে কবিতা আবৃতি করে—

সৃষ্টির প্রথম স্মৃতি হতে
সহসা আদিম শব্দ সঞ্চরিল
তোর রক্তপাতে
তাই এ তরুতে তৃণে
প্রাণ আপনারে চিনে
হেমন্তের মধ্যাহ্ন বেলা—

মৃত্তিকার খেলা ঘরে
কত যুগ যুগান্তরে
হিরণে হরিতে তোর খেলা।

বাব্বা পরশ ভাইয়া তুমি এতো জান? কার কবিতা ভাইয়া?

রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি। বিচিত্রগামী তার কবিতা বিচিত্র কষ্টে সুখে দুঃখে, সঙ্কটে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য পরশে মনটাকে ভরে দেয়।

"আমরাও তোমার মতো পড়ার বই এর বাইরে বই পড়বো। তোমাকে নিয়ে একদিন নিউ মার্কেটে যাবো। তোমার পছন্দ মতো বই কিনে দিও। অবসরে আমরা সেসব বই পড়বো।" রনির কথায় পরশ ওকে জড়িয়ে ধরে।

"হ্যাঁ তোদের ও অনেক বড় হতে হবে। তোরা তো মুক্তিযোদ্ধার সন্তান।"

"তুমি ও তো"।

পরশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে 'হু' বলে।

"কাল কিন্তু বিকেলে বের হচ্ছি।" রনির কথায় হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো নিশ্চয়ই। তবে সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরে পড়তে বসতে হবে।

"পরশ ভাইয়া আরেকটি কবিতা শোনাও না।" রনি আবদার করে বলে।

"বাড়ি থেকে আমার কোন বই, গল্পের কবিতার ও অন্যান্য বইগুলো আনিনি। এবার বাড়ি গেলে নিয়ে আসবো। আগে থাকার জায়গা ঠিক হউক।"

"আরে তুমি তো আমাদের বাসাতেই থাকবে। হোস্টেলে থাকলে তোমাকে কাছে পাব না।"

রবির কথায় পরশ হেসে বলে "দেখা যাক সময় কী বলে।"

এবার কবিতা শোনাও।

থেকে থেকে ছোট করে ঝলকে ঝলকে
বর্ষার সমৃদ্ধ রূপ-নাকি মৃত্তিকার রস
কখনও বা উদ্দাম সরসতা কখনও বা
শিথিল পলকে
সূর্যের হীরক দ্যুতি

"কার কবিতা? এটি ও কী রবীন্দ্রনাথের?"

"নাহ্ বিষ্ণুদে'র।"

"এতো পড়া তোমার?"

"অবসর সময় এসবই পড়ি। কবিতার বই বন্ধ করে এবার ঘুমাই। তোদের পড়া শেষ তো?"

"হ্যাঁ শেষ।"

তবে চল শুয়ে পড়ি। কাল সকালে বাইরে যাবার তাড়া নেই।

"ঘুম থেকে দেরীতে উঠবো। তোরা আমাকে ডিসটার্ব করবি না।"

বাতি নিভিয়ে তিনজনই শুয়ে পড়ে। কিন্তু কী হলো পরশের ঘুম আসছে না কেন? কত রাজ্যের চিন্তা ওর মাথায়। ওর শৈশব, বড় হওয়া কষ্টটাকে বুকে চেপে বড় হবার স্বপ্ন দেখেছে। জীবনের এক বাঁক থেকে আরেক বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বাঁক কেমন হবে? শহরে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলোর দিকে যেতে পারবে তো? আরো কত মেধাবি ছাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলোটা ছিনিয়ে নিতে পারবে তো? অধ্যক্ষ স্যার পরশুদিন ডেকেছেন। কী বলবেন উনি। ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায় সে অন্তত স্বয়ং অধ্যক্ষের স্নেহের পাত্র হতে পেরেছে। যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে পরশের। পরশ দেরী করেই ঘুম থেকে উঠে। প্রায় দশটা বাজে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আতকে উঠে। "এতো দেরী?"

তাড়াতাড়ি গোসলটা সেরে বসার ঘরে আসে। বসার ঘরে সবুর পত্রিকা পড়ছে।

"কিরে খুব ঘুমালে বুঝি?" সবুরের প্রশ্ন পরশ বলে—"আজ তো বাইরে যাবার তাড়া নেই। তাই ...

"তাই বুঝি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিস?"

"নিশ্চিন্তে নয় বাবা। ক্লাস শুরু হবে আগামী মাসের দুই তারিখে। সে টেনশনটা তো আছেই।"

"টেবিলে তোর চাচী নাস্তা ঢেকে রেখেছে। যা খেয়ে নে।"

"তোমরা খেয়েছো? চাচা কী দোকানে গেছে?"

"হ্যাঁ সবাই মিলেই নাস্তা খেয়েছি। রমিজ তো একটু আগেই দোকানে গেল। যা তুই খেয়ে নে।"

চাচী ও চাচী .. ডাকতে ডাকতে একেবারে রান্না ঘরে চলে যায় পরশ।

বাবা তুই ঘুমাচ্ছিলি। তাই ডাকলাম না। তোর নাস্তাটা টেবিলে ঢাকা আছে। দাঁড়া রুটি গুলো সেঁকে দেই।

রমিজের স্ত্রী যত্ন করে রুটিগুলো সেঁকে টেবিলে পরশের পাশে বসে। সবুর এসে বসে। "চাচী আমরা এসে তোমার বাড়তি কষ্ট হচ্ছে তাই না?"

পরশের কথায় রমিজের স্ত্রী হেসে বলে—"কষ্ট কিরে। এটা তো আনন্দের। তুই এসেছিস, ভাইজান এসেছেন। এ ওছিলায় বাসায় কত হৈ চৈ হচ্ছে। তোর জন্যই ভাইজান ঢাকায় এসেছেন। নইলে কী আসতেন? তুই এখন ঢাকায় আমার কাছেই থাকবি। এটা কী কম আনন্দের?"

"এক আপনজন ছেড়ে আরেক আপনজনের কাছে এসেছি। আমার জন্যও তা আনন্দের? আমার জন্য দোয়া করবেন চাচী।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে "আমি যেন গোটা পরিবারের দোয়া আমার উপর পাই।"

"ভাইজান কী চা খাবেন?"

"হ্যাঁ দাও পরশের সাথে আমিও এক কাপ খেতে পারি।"

বাপ ব্যাটা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসার ঘরে সোফায় বসে। রমিজের স্ত্রী রান্না ঘরে চলে যায়।

"তা পরশ ক্লাস শুরু হওয়ার আগে তোর বই খাতা তো কিনতে হবে।"

বাবা ভেব না তো। স্যারের দেয়া টাকা কিছু পকেটে আছে। "আগে ক্লাস শুরু হোক। কী বই কিনতে হবে তখনই জানা যাবে। এসব নিয়ে তুমি ভেব না তো।"

"কাল অধ্যক্ষ স্যার যেতে বললেন কেন বলতো? হাতে করে তো কিছু নিতে হবে।"

"নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো কিছু। স্যার কেন ডেকেছেন আমিও ভাবছি। গিয়ে দেখি স্যার কী বলেন।"

"তুই কী কোথাও বের হবি? আমি রমিজের দোকান থেকে ঘুরে আসি।"

"যা বাবা যাও। আমি পাবলিক লাইব্রেরিটা ঘুরে আসি। একটার মধ্যেই ফিরে আসবো।"

"তৈরি হয়ে নে। দুজনে এক সঙ্গেই বের হই।"

পরশ তৈরি হবার জন্য ঘরে যায়। সবুর নিজেও তৈরি হবার প্রস্তুতি য়ে।

দুজনে পথে যেতে যেতে সবুর বলে—"যাবার আগে তোকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিয়ে যাবো। অপুর মোবাইলে যোগাযোগটা থাকবে।" "মোবাইল কিনে দেবার জন্য তোমার কাছে টাকা আছে?" আছে বাবা আছে। অপু টাকা দিয়েছে। আমার জমানো টাকাও নিয়ে এসেছি। সে ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি। তুই জানিস না।"

সবুরকে দোকানে নামিয়ে দিয়ে পরশ চলে যায় পাবলিক লাইব্রেরিতে। ঘরে ঘরে বই সাজানো। পরশ ঘুরে ঘুরে দেখে। কমার্স বিষয়ক বইয়ের তাক খুঁজে কয়টা বই নিয়ে টেবিলে বসে। মনোযোগ দিয়ে বইর পাতা উল্টিয়ে দেখে আর পড়ে। এভাবে সময় যে কখন গড়িয়ে যায় পরশ টেরই পায় না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে দুটো বাজে। বইগুলো জায়গায় রেখে পরশ বেরিয়ে পড়ে। একটা রিক্সা নিয়ে সোজা বাসায় ফিরে।

ঘরে ঢুকেই চাচীকে ডাকে। "চাচী রনি, রবি স্কুল থেকে কখন ফিরে?"

"ওরা ফিরে চারটায়। ফিরেই তবে খায়। তুমি খেয়ে একটু বিশ্রাম নাও।"

"ঠিক আছে চাচী আমি খেয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারি। রনি, রবি বিকেলে আমাকে নিয়ে বের হবে আগেই বলে রেখেছে।"

ঠিক আছে তুমি খেয়ে নাও। দোকানের কর্মচারী এসে তোমার চাচা বাবার খাওয়া নিয়ে গেছে।"

"আপনি খাবেন না?"

"তোমার সঙ্গেই খাবো। চলো।"

"ঘুরতে বেরিয়েছো বুঝি?"

চাচীর প্রশ্নে পরশ মাথা নেড়ে বলে—

"নাহ্ চাচী কোথাও ঘুরতে যাইনি। একটা লাইব্রেরিতে বই পত্রগুলো দেখে আসলাম রনিই আমাকে এ লাইব্রেরি চিনিয়েছে। আমার পড়ালেখায় এই লাইব্রেরি কাজে লাগবে।

চাচীর সঙ্গে খেয়ে পরশ বিশ্রামের জন্য ঘরে চলে যায়।

বিকেলে রনি রবি স্কুল থেকে ফিরেই মাকে ডাকতে ডাকতে খাওয়ার টেবিলের কাছে আসতেই মা ছুটে আসে।

"আমি খাবার দিচ্ছি তোরা হাত মুখ ধুয়ে আয়।"

"পরশ ভাইয়া কী বাসায়?"

"হ্যাঁ ঘরে আছে।"

দু ভাই ছুটে যায় ঘরে। পরশ ঘুমাচ্ছে। পরশকে না ডেকে নীরবে হাত মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে আসে। মা দু ছেলেকে যত্ন করে খাওয়ায়।

দু ভাই তাড়াতাড়িই খাওয়া সেরে নেয়।

"কিরে কিছুই খেলি না।"

ওদের যে কিসের তাড়া তাতো মা বোঝে না। পরশকে নিয়ে ওরা বের হবে।

দু ভাই ঘরে ঢুকেই পরশকে ডেকে তোলে।

"ভাইয়া ভুলে গেছো আজকের প্ল্যান?"

"নাহ্ কিছুই ভুলিনি। তোদের জন্য অপেক্ষা করতে করতেই তো ঘুম এসে গেল। চল, তৈরি তো? বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু যাবি কোথায়?"

আগে বের হই তো।

ওরা বেরিয়ে পড়ে। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পরশ আবার প্রশ্ন করে।

"কোথায় যাচ্ছি আমরা"?

মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে। সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরটা কী গেলেই বুঝতে পারবে যাদুঘরে কী আছে।

'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরশের ভেতরটায় ঝড় উঠে। যে মুক্তিযুদ্ধ পরশের জীবনের সবটুকু জুড়ে। অথচ কেউ তা জানে না।

"সেখানে কী আছে রে?" পরশের প্রশ্নে রনি মোটামোটি সব খুলে বলে।

মনটা রোমাঞ্চিতও হয়ে উঠে পরশের।

তিনজন একটা রিক্সা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের দিকে রওনা দেয়। পথে যেতে রনি দেখায় এটি শিশুপার্ক। এটি ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট, এটি শিল্পকলা একাডেমি। "ঢাকা শহরে আরো কত কী আছে দেখার" রনি বলে। পরশের কানে কিছুই ঢোকে না। মনের ভেতর তোলপাড় হচ্ছে 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটি! হায়রে মুক্তিযুদ্ধ! মুক্তিযুদ্ধ ওকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এল। অথচ কষ্টের কথাটা কাউকেই বলা যাচ্ছে না। চোখের পাতা ভিজে আসে পরশের।

ওরা পৌঁছে যায় মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে। ঘুরে ঘুরে দেখে তিনজনে মিলে। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত সংরক্ষিত কত জিনিস, ব্যবহৃত জিনিস। অনেক শহীদের ছবি। দুখানা মুখ খুঁজে বেড়ায় পরশ। অথবা তাদের ব্যবহৃত

জিনিস। নাহ্ কোথাও নেই। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে ঝাপসা স্মৃতিগুলো পরশের চোখের উপর ভেসে উঠে। এ স্মৃতি তো এখানে নেই। পরশের দম বন্ধ হয়ে আসে। পরশ বলে "চল বেরিয়ে পড়ি। তোরা কিছু খাবি?"

মনটাকে হালকা করতে চায় সে।

রনি বলে চল বেইলি রোডে বার্গার খাবো।

"কেমন লাগলো যাদুঘরটি।" রনির প্রশ্নে ছোট জবাব "দম বন্ধ করা পরিবেশ। শহীদের স্মৃতি। স্মৃতিগুলো কষ্টের নয় কী? এই প্রথম দেখা তো? পরে আসলে ঠিক হয়ে যাবে।"

সময় মত রওনা দেয় ওরা। যাওয়ার পথে ফল মিষ্টি কিনে নেয়। "স্যার কী বলতে পারে রে?"

পরশ অন্য মনস্ক হয়ে জবাব দেয়—"কী জানি কী বলবে।"

সময় মত পৌঁছে যায় ওরা। কলিংবেল বাজাতেই কাজের ছেলেটি দরজা খুলে পরশকে দেখতে পেয়ে হেসে বলে—"আসুন ভেতরে আসুন। আমি ভেতরে খবর দিচ্ছি।" সবুর ও পরশ বসার ঘরে বসে। মিষ্টি ও ফলগুলো সামনের টেবিলে রাখে। পরশ ভেতরে ভেতরে ঘামছে- কেন আসতে বলেছেন স্যার?

কাজের ছেলেটি ভেতরে খবর দিতেই স্যার ভেতর থেকে ধীর পায়ে বসার ঘরে আসেন। "কি হে পরশ বেটা কেমন আছো? ভর্তি হয়ে খুশি হয়েছো তো?"

"জ্বি স্যার খুশি তো লাগছেই।" ছোট জবাব।

তা ... তোমার বাবার নামটা যেন কী?

সবুর নিজেই জবাব দেয় —"সবুর মোল্লা।"

"প্রথম দিন দেখা হয়েছিল—নামটা বলেছিলেন প্রতিদিন এতো লোক আসে—আপনার নাম বলেছিলেন, কিছু মনে করবেন না। নামটা ভুলে গিয়েছিলাম। একি এতো মিষ্টি ফল কেন?"

"গ্রাম থেকে এরপর আসার সময় পিঠা নিয়ে আসবো। শহরে তো সে পাওয়া যায় না।"

সবুরের কথায় স্যার হেসে বলে "পরশের বদৌলতে পিঠাও খাওয়া যাবে। কি বলো পরশ?"

হ্যাঁ স্যার আমার মা খুব ভাল পিঠা বানাতে পারে। বাবা এরপর আসার সময় নিয়ে এসো।"

কাজের ছেলেটা ট্রে ভর্তি চা নাস্তা নিয়ে আসে।

"পরশ খাও। তোমার বাবাকেও দাও।"

"এতো খাবার?" পরশ ও সবুর এক সঙ্গেই বলে উঠে।

"ইয়ং বয়। খাও খাও।"

সবুর খেতে খেতে বলে—"ছেলেটিকে কোলে পিঠে মানুষ করেছি। শহরের হালচাল কিছু বোঝে না। আপনিই ওর অভিভাবক। এ ভরসা নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবো। ওকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম স্যার।"

"আপনি ভাববেন না। পরশ নামটা খুব সুন্দর নাম। তা কে রেখেছে এ নাম?"

সবুর থতমত খেয়ে যায়। কী জবাব দেবে পরশের সামনে? "আমার জন্মের পর থেকেই এ নামই তো ডাকে।" পরশ অন্যভাবে জবাবটা দিয়ে সবুরকে অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচায়।

স্যার কাজের ছেলেকে ডাকে। ছেলেটি ছুটে আসে "জ্বি স্যার।"

"বনফুল কোথায়রে? ভেতরে গিয়ে বল পরশ দেখা করবে।"

"জ্বি স্যার" ছেলেটি ভেতরে যায়। আবার ফিরে আসে।

"খালাম্মা বলছেন ভাইয়াকে নিয়ে যেতে ভেতরে।"

"পরশ যাও ... বনফুলের সঙ্গে দেখা করে এসো।"

পরশ খুশিতে উঠে যায় ভেতরে। সেদিনের বনফুলের আন্তরিকতা পরশ আজও ভোলেনি।

পরশ উঠে যেতেই অধ্যক্ষ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সবুরের দিকে।

"আচ্ছা সবুর সাহেব পরশের কথা সেদিন আমাকে যা বললেন আমার ভেতরটা আজও তোলপাড় করছে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ অথচ এ গর্ব এবং ক্ষতটা আজও আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। কী মহৎ কাজ করেছেন আপনি জানেন না। আচ্ছা পরশের কী সে সব কথা মনে আছে?"

কী জানি, আমি জানি না। পরশ মুখ ফুটে কিছুই বলে না। কোন ঝাপসা স্মৃতি ওর মনের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে কিনা জানি না। যতই বড় হয়েছে, দেখেছি ভালো ভাবে লেখাপড়া করে বড় হবার আপ্রাণ চেষ্টাই করেছে। আমি শুধু ছায়ার মতো ঘিরে রেখেছি। সেদিনের সে দুঃসহ স্মৃতি বুকের ভেতর লালন করে চলেছি।"

"পরশ কী আপনাকে কিছু বলেছে?"

"জ্বি স্যার পরশ সব বলেছে।"

আপনি আমাকে পরশ সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তা কী সে জানে?"

"নাহ্ স্যার। এ-ই প্রথম আপনাকেই বললাম।"

"ভালো করেছেন।"

একটু থেমে আবার স্যার বলেন—"তা আপনি কী ভাবছেন? দেখুন ছাত্র রাজনীতি একটা ব্যাধির মতো। বলা যায় সংক্রামক ব্যাধি। পরশ চিন্তা চেতনায় স্বচ্ছ। পড়ালেখাটাই ওর মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার একমাত্র ছেলে আমেরিকায় থাকে। গোটা বাড়িতে আমি আর আমার স্ত্রী। পরশ আমার বাসায় থাকলে প্রপার গাইডেন্সে থাকবে। ওর দৃষ্টি ও অন্তরের স্বচ্ছতায় বাইরের কোন ধোঁয়া পড়ুক আমি চাই না। আপনি নিশ্চয়ই চান না।"

"আপনি যা ভাল মনে করেন। আমার ভাই কাঠের ব্যবসা করে। শ্রমিক লীগের যুগ্ম সচিব। তিন ছেলে মেয়ে। সে বোধ হয় চায় পরশ ওখানে থাকুক। এক ছেলে ক্লাস টেনে, আরেকজন অষ্টম শ্রেণীতে, মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে। যদিও আমার ভাই এখনও মুখ ফুটে কিছু বলেনি। কিন্তু আমার মন সায় দেয় না। কারণ তিনটি ছেলে এক ঘরে থেকে পড়ালেখা করলে পরশেরই অসুবিধা হবে।"

পরশ ফিরে আসে বসার ঘরে। "পরশ তোমাকে নিয়েই কথা বলছিলাম।" অধ্যক্ষের কথায় পরশ বিনম্রভাবেই জানতে চায় "কী কথা স্যার?"

"বলছিলাম তুমি আমার বাসায় থেকেই ক্লাস করবে।"

হ্যাঁ স্যার সেদিন তো তাই বলেছিলেন। বাবাকে জানিয়েছি। তা বাবা কী বললেন?"

"তোমার আপত্তি আছে কিনা আগে বলো।"

আপনার অভিভাকত্বে আমি পড়ালেখা করতে পারবো তা কজনের ভাগ্যে জোটে। বাবার আপত্তি না থাকলে...।

সবুর হাত বাড়িয়ে বলে—"এ পরম সৌভাগ্য। আপত্তির তো প্রশ্নেই উঠে না বাবা।"

"ওর খরচের কথা ভাববেন না। কলেজে থেকে একটা ভাল বৃত্তি পাবে। সবুর সাহেব আপনি যা পারেন তাই দেবেন। আর আমি তো আছিই। আমার আরেকটা ছেলে থাকলে আমি করতাম না? আজ থেকে পরশ আমারও ছেলে। গোটা বাংলাদেশের ছেলে। পরশ তোমার আন্টিকে ডেকে এনে তোমার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।"

পরশ উঠে যায় ভেতরে ডাকে "আন্টি, আন্টি।"

বনফুল ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। " কী বাবা?"

"আমার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।"

"হ্যাঁ চলো।"

দুজনে বসার ঘরে পাশের সোফায় বসে।

"আপনার ছেলে অসম্ভব ভাল ছেলে। একজন গর্বিত বাবা আপনি। অজোপাড়া গ্রামে এক আদর্শবান বিনয়ী ভদ্র ছেলের জন্ম দিয়েছেন। দুদিনেই পরশ আমাদের আপন করে নিয়েছে।"

"সবই আল্লাহর ইচ্ছে। ওর জন্য দোয়া করুণ। আমি তো উপলক্ষ মাত্র।"

অধ্যক্ষের দিকে তাকিয়ে বনফুল বলে—"পরশ যে এ বাসায় থেকে পড়ালেখা করবে বলেছো ওনাকে?"

"হ্যাঁ বলেছি। ক্লাস শুরু হউক। তারপর ক্লাস শুরুর আগে কিন্তু পরশ বাসায় এসে আন্টিকে দেখে যেও। বুক সেলফ থেকে পছন্দের বই পড়বে আর আমি তোমার পাশে বসে কবিতা লিখবো।"

"আপনি কবিতা লেখেন?"

"কবিতা লিখেই অবসর কাটাই।"

"পরশকে বলো তোমার তিনটে কবিতার বই বেরিয়েছে।" স্যার গর্বের সঙ্গে বলে।

"আরেকদিন এসে আপনার কবিতা পড়বো।" পরশ পরম উৎসাহে বলে।

আবার চায়ের পর্ব শুরু হয়। বনফুলই কাজের ছেলেকে ডেকে চা দিতে বলে।

"তুমি বই পোকা ছেলে প্রথম দিন তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি। কবিতা পড়ার অভ্যাস আছে?"

পরশ হেসে বলে "কবিতা আমার অত্যন্ত প্রিয়। গল্প উপন্যাসও"।

"যাক কবিতা লেখার জন্য উৎসাহ দাতা একজন পাওয়া গেল।" "আপনাকে উৎসাহ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই।"

"আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে।"

আবার চায়ের পর্বও শেষ। সবুর বিনয়ের সঙ্গে বলে "অনুমতি দিলে আজ উঠি স্যার?"

"খুব ভাল সময় কাটলো আপনাদের সঙ্গে। তা আপনি গ্রামে ফিরছেন কবে?"

"২/৩ দিন পর। পরশের জন্য কিছু বই কিনতে হবে।"

"আমার কলেজে কমার্সের শিক্ষক সৌরভ চৌধুরী আছেন। তাঁকে আমি বলে রাখবো। তুমি কাল কী পরশু তার সঙ্গে দেখা করো। উনি-ই তোমাকে কী বই কিনতে হবে—কী করতে হবে এসব ব্যাপারে গাইড করবে। কিছু না জেনে হুট করে কোন বই কিনতে যেও না। সৌরভই তোমাকে সব বল দেবে।"

"ঠিক আছে স্যার।" পরশ বনফুল ও স্যারের পা ধরে সালাম করে। সবুরও বলে "ছেলেকে আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। আজ আসি স্যার।"

সবুর ও পরশ বেরিয়ে আসে। লম্বা মাঠ পেরিয়ে কলেজ গেইটের বাইরে এসে দাঁড়ায়। "বাড়ি যাবো?"

সবুরের প্রশ্নে পরশ হেসে বলে "চল বাবা ফুটপাথ ধরে হাঁটি। সামনে দেখছো না কত দোকান। অপুদা ও মায়ের জন্য কিছু কিনি।"

"নাহ্ আজ থাক।"

"কেন?"

"কাওরান বাজারটা আমার খুব পছন্দ। কিনলে ভাবী রনি, রবি, রুহিনের জন্য ও কিনবো। বরং চল কাওরান বাজারে যাই। সেখান থেকে কেনা কাটা সেরে রমিজের দোকানে যাবো। ওকে নিয়েই বাসায় ফিরবো।"

"চাচার জন্য ও কিনতে হবে।"

ঠিক আছে। কিনবো।

একটা রিক্সা নিয়ে ওরা পৌঁছে যায় কাওরান বাজারে। ঘুরে ঘুরে দোকান দেখে। একটা দোকান থেকে দুটো ভাল তাঁতের শাড়ি কিনে। রমিজের জন্য পাঞ্জাবি রুহিনের জন্য সুন্দর ফ্রক, আর অপু, রনি, রবির জন্য ৩টি শার্ট।

"তুমি কিছু কিনবে না বাবা?"

"নারে। আমার কিছু লাগবে না।

"তা হয় না বাবা। চাচার জন্য যেমন পাঞ্জাবি কিনেছি। ওরকম তোমার জন্য লুকিয়ে কিনে ফেলেছি।"

"তোর হাতে যে আর টাকা থাকলো না।"

"ক্লাস শুরু হলেই তো আমি স্যারের বাসায় চলে যাবো। বৃত্তির টাকাটা সম্ভবত শুরুতেই পেয়ে যাবো। পেতে দেরী হলে চাচার কাছে চেয়ে নেবো।"

"তবে কী ঠিক করেছিস স্যারের বাসাই থাকবি?"

"বাবা এতো বড় একজন অভিভাবক আমি হাতছাড়া করতে চাই না। সেখানে নিরিবিলিতে আমার পড়ালেখার সুবিধা হবে। হোস্টেলে থাকতে চাই না কারণ যদি কোন ক্রমে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। আর...চাচার বাসায় এক রুমে

তিনজনের পড়ালেখার বিঘ্ন ঘটবে। ওরা পরীক্ষায় ভাল ফল করত না পারলে দোষটা পড়বে আমার ঘাড়ে। এতো ছোট রুমে গাদাগাদি করে পড়ার পরিবেশটা আমি পাব না। তার চাইতে রনি, রবিকে এসে এসে অঙ্ক বিজ্ঞানটা পড়িয়ে যাবো।"

"সময় পাবি তুই?"

সময় বের করে নেবো। সে তুমি ভেব না।

কথা বলতে বলতে কাওরান বাজারে পৌঁছে রমিজের দোকানে চলে যায়।

"কিরে কোথা থেকে এলি পরশ?"

"বলব বলব সব কথা বলব। একটু চা আর সঙ্গে কিছু খাওয়ায়। অনেক ঘুরেছি আজ।"

"খুব কেনাকাটা করেছিস বুঝি?"

"দেখ কী কিনেছি।" পরশ এক এক করে সব কটা প্যাকেট খুলে চাচাকে দেখায়। "পছন্দ হয়েছে চাচা?"

"একি সবার জন্য? কী টাকা এনেছিস তাতো আমি জানি। এর মধ্যে ভর্তি হয়েছিস। ভাইজান কেন মিছি মিছি টাকা খরচ? পরশের তো সামনে খরচ পড়ে আছে।"

সবুর গলা কাঁপিয়ে বলে—অধ্যক্ষ স্যার পরশের ভর্তি ও অন্যান্য খরচের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল কদিন আগে। ভর্তিতে এতো টাকা খরচ তো হয়নি। বাকি টাকা দিয়ে পরশই শখ করে এগুলো কিনলো।" "শুধু পরশকেই দিয়েছে?"

"তা জানি না বোধ হয় গরিব ছাত্রদেরও দিয়েছে।"

ইতিমধ্যে চা নাস্তা চলে এসেছে।

চা খেতে খেতে সবুর ভয়ে ভয়ে বলে "আজ অধ্যক্ষ স্যার আমাদের দুজনকে বাসায় ডেকেছে। বিকেলে গিয়েছিলাম। তাঁর আন্তরিকতা দেখে মনে হলো স্যার পরশকে খুব পছন্দ করেছেন। পরশের কিসে ভাল হবে তা নিয়ে তিনি ভাবেন। পরশকে নিজ তত্ত্বাবধানে রাখতে চান তিনি।"

"মানে?" রমিজ আগ্রহের সঙ্গে বলে।

"স্যার সরাসরি পরশকে হোস্টেলে না থেকে তাঁর বাসায় থাকার কথা বললেন। তার ভয় হোস্টেলে থাকলে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে কোন বিপাকে পড়ে।"

"ছাত্র রাজনীতি কী খারাপ কিছু? ছাত্র রাজনীতি করলে করবে তাতে কী?"

"রমিজ আমিও চাই না পরশ নিজের অজান্তেই কিসে জড়িয়ে পড়ুক। আগে পড়ালেখাটা সারুক। সুষ্ঠ রাজনীতি করার সময় পড়ে আছে। তুই তো আছিসই। এখন লেখাপড়াই ওর মুখ্য। স্যারের বাসায় থাকাটা আমিও সমর্থন করি। ওর প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। আশা করি তুইও আপত্তি করবি নে।"

"রনি, রবিকে পড়াবার কথাটা পরশকে বলেছিলাম।"

"চাচা সে নিয়ে তুমি ভেব না। বিকেল বেলাটা আমি ঠিক সময় অঙ্ক বিজ্ঞান পড়াব। দেখে নিও ওদের আমি সেরা ছাত্র বানাবো। আমার ক্লাস শুরু হতে আগামী মাস। ওদের নিয়ে কিছু ভেব না তুমি। নিশ্চিন্তে থাকো।"

রমিজ নিজেও পরশের ভাল চায়। স্যারের বাসায় থাকবে—সেখানে পড়ালেখা ভাল হবে। এটি বড় সুখের খবর। পরশকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—"সোনার মানুষ না হলে সোনার দেশ হবে কী করে। তুই স্বাধীন বাংলার সোনার মানুষ হবি।

চল বাসায় চল। চাচা তোমার কাজ থাকলে সময় হাতে নিয়ে সেরে নাও। এ ফাঁকে রনি, রবির পড়াটাও শেষ করে ফেলবে। আমরা ফিরলে তো হৈ চৈ শুরু করে পড়ার পাঠ চুকাবে। এ ফাঁকে আমি বাইরে ঘুরে আসি। তোমরা গল্প করো।"

পরশ বেরিয়ে যায়। "দেখলি রমিজ, রনি, রবির পড়ালেখা নিয়ে কতটা ভাবে। দেখবে তুমি রনি, রবিকে পড়ালেখায় কতটা মনযোগী করে তোলে। গ্রামেও পরশ টিউশনি করেছে। ওরা সবাই স্কুলে খুব ভাল Result করেছে। আমি ২/১ দিনের মধ্যে বাড়ি চলে যাবো। ওকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। একদিকে স্যার অন্য দিকে তুমি। পরশ ভাল থাকবে-এ-আমার বিশ্বাস।"

পরশ বেশ কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে দোকানে ফিরে উল্লাসে বলে—চলো চাচা বাসায় যাই। ইতিমধ্যে ওদের পড়া শেষ হয়েছে নিশ্চয়ই। আমাদের জন্য নির্ঘাত অপেক্ষা করছে।

হ্যাঁ চল। রমিজ ক্যাশ বাক্স বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। চলুন ভাইজান।

বাসায় ঢুকেই পরশ গলা ছেড়ে ডাকে। "কই রনি, রবি, রুহিন, চাচী তোমরা কোথায়?" সবাই ছুটে আসে বসার ঘরে।

"কী ব্যাপার এতো চেঁচামেচি কেন রে পরশ। কোন সুখবর আছে নাকিরে?"

চাচীর কথায় পরশ তাঁর হাত খানা ধরে সোফায় বসে। রনি, রবি, রুহিন চাচা বাবাকে ও ডাকে।

"দেখ কী এনেছি তোমাদের জন্য? বলতে বলতে পরশ দু'খানা শাড়ি চাচীর হাতে তুলে বলে—"চাচী যে শাড়িটা তোমার পছন্দ সেটি তোমার বাকিটা মায়ের।"

"সে কিরে শাড়ি আনতে গেলি কেন রে? যেদিন রোজগার করবি সেদিন দিবি।" কথাটা বলে পরশের কপালে চুমু খায়। চাচার হাতে চাচার পাঞ্জাবি বাবারটা হাতে তুলে বলে "পছন্দ হয়েছে চাচা?"

রুহিনের ফ্রকটা ওর হাতে দিয়ে বলে "পছন্দ হয়েছে?" খুব সুন্দর। তোমার পছন্দ তো খুব ভাল। রুহিন খুশিতে টগবগ। পরশ রনি, রবিকে তিনটা প্যাকেট দিয়ে বলে—"খোল। যে দুটি তোদের পছন্দ বেছে নে। আরেকটা অপু ভাইয়ার জন্য। নে খোল।"

"ভাইয়া তুমি চাকরি করে ফিরেছ? সামনে তোমার কত খরচ। বই খাতা কেনা, বেতন, কলেজে আসা যাওয়ার খরচ, হাত খরচ ভেবেছো। এ খরচটা কেন করলে?"

আরে বোকা ছেলে কলেজে বৃত্তি পেয়েছি—আর বাবা তো খালি হাতে আসেনি। এমন কী কিনলাম? সামান্য কিছু।

রনি, রবি প্যাকেট খুলে। তিনটি টিশার্টের মধ্যে দুটো বেছে নেয়—একটি অপুর জন্য রাখে। সবার জন্য আনা উপহার নিয়ে অনেকক্ষণ হৈ চৈ চললো।

রমিজের স্ত্রী সবাইকে খেতে ডাকে। খাওয়ার টেবিলেও নানান রকমের আলোচনা।

"বাবা পরশ ভাইকে তোমার শ্রমিক লীগে কাজে লাগাও।" রনির কথায় পরশ রনির পিঠে মৃদু থাপ্পড় মেরে বলে "শ্রমিক লীগ আমি রাজনীতিই বুঝি না। দেশ সেবার জন্য রাজনীতির বাইরে ও দেশের কাজ করা যায়। কী বলেন চাচা?"

"পরশের যে সততা নিষ্ঠা লেখাপড়াই ওর একমাত্র ওকে সমাজে যোগ্য করে তুলবে। তোমরা পরশকে দেখে শেখো।" রমিজের কথায় পরশ লজ্জা পায়।

পরশ ভাইয়া এসে আমাদের বাসার পরিবেশ পাল্টে গেছে। লেখাপড়াটা যে কী আমরা আজ পলে পলে বুঝতে পারছি।

"এবার বোধহয় হয়েছে তো? দেখা যাক পড়ালেখার উন্নতি কেমন করিস।" রমিজ গম্ভীর হয়ে বলে।

"চাচা আপনি ভাববেন না অবসর সময় আমি ওদের পড়াব। এমন কী কলেজে ভর্তি হলেও বিকেল বা সন্ধ্যাবেলা এসে পড়াবো।"

"বাবা পরশ ভাইয়াকে কী সে জন্য পরিশ্রমিক দেবে না?"

"দেব কী দেব না তোদের ভাবতে হবে না।"

ঘুমাতে এসে রনি বলে "পরশ ভাইয়া তুমি আমাদের নতুন শিক্ষক হলে। কি যে আনন্দ লাগছে।" "আমার ও আনন্দ লাগছে আমার ছোট ভাইদের আমি দেখবো। কাল স্কুল থেকে আসলেই পড়ার টেবিল। আমার ক্লাস শুরুর আগে অঙ্কে বিজ্ঞানে তোদের অনেক দূর এগিয়ে দেবো।"

"তুমি তো আমাদের বাসায়ই থাকবে।" রনির কথায় বুকে জড়িয়ে ধরে পরশ ওকে।

"নারে আমি কলেজ অধ্যক্ষ স্যারের বাসায় থাকবো। খুব ভাল মানুষ উনি।"

"কেন অধ্যক্ষের বাসায় থাকবে?"

দু ভাই এক সঙ্গে প্রশ্ন করলে পরশ বলে—"স্যার চাইছেন নিরিবিলিতে আমার পড়ালেখাটা হউক সে জন্য তিনি নিজেই আমাকে আর বাবাকে ডেকে প্রস্তাবটা দিলেন। স্যারের এক মাত্র ছেলে বিদেশে থাকে। আমাকে উনি ছেলের মতই মনে করেন। এমন কী তাঁর স্ত্রীও। ও নিয়ে ভাবনার কিছু নেই তোদের। তোদের পড়াবার জন্য সময় বের করে নেবো। তবে ... একটু অসুবিধা যে হবে না তা নয়।"

"অসুবিধাটা কী?"

"যখন তখন বিনা অনুমতিতে বের হতে পারবো না। নানান প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তা আমি ম্যানেজ করে নেবো।"

"আমরা কী মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবো?"

"এ নিয়ে পরে ভাবিস তো। স্যারের স্ত্রী খুব সুন্দর কবিতা লেখেন। গোটা বাসা একটি লাইব্রেরি বলা যায়। স্যারের স্ত্রীর নামটা খুব সুন্দর বনফুল। ভারি চমৎকার মহিলা আমাকে তার প্রকাশিত কবিতার একটি বই উপহার দিয়েছেন।"

"দেখি, দেখি।" রনি লাফিয়ে উঠে দেখার জন্য। পরশ ব্যাগ থেকে কবিতার বইখানা বের করে বই খানার নাম "বৃষ্টি পড়ে ঝুপঝুপ।"

পরশ ভাইয়া কটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও না এ গ্রন্থ থেকে।

পরশ কবিতার বই খানা নিয়ে আবৃত্তি করে—

লাল টিপ পরা মেয়েটি
এলো হেসে শ্রাবণের শেষ দিনে—
বৃষ্টি ভেজা শরীর
বৃষ্টি ভেজা চোখের পাপড়ি।
বৃষ্টি ভেজা চুল
শরীর জুড়িয়ে বিন্যস্ত ফুল

সুগন্ধি ছড়ায়
বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
বৃষ্টি ঝরে হৃদয় জুড়ে
বৃষ্টি পড়ে শুকনো পাতায়
বৃষ্টি পড়ে ঝুপঝুপিয়ে
স্বপ্ন জাগে বৃষ্টি ধোয়া জলে
মেয়েটি খিলখিলিয়ে হাসে
বৃষ্টি ভেজা শরীরে বুক পেতে দেয়
আকাশের দিকে।

মুগ্ধ হয়ে শুনে দু ভাই। পরশকে জড়িয়ে ধরে আরেকটি প্লিজ। যা শোনালে ভাইয়া আজ সারা রাত স্বপ্নে বৃষ্টিতেই ভিজবো। পরশ পাতার পর পাতা উল্টিয়ে যায়। অনেক কবিতা। কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়বে। মনটা লোভী হয়ে উঠে। ইচ্ছে হয় সারারাত জেগে গোটা কবিতার বইটার সব কটি কবিতা আবৃতি করতে। তা সম্ভব নয়। কাল ওদের স্কুল। এ জন্যই অধ্যক্ষ স্যারের বাসায় থাকা শ্রেয়। নিজের প্রাইভেসিটা থাকবে। কী হলো ভাইয়া আবৃত্তি করো না আরেকটি। আরেকটি পড়লে শুয়ে পড়বি কিন্তু।

হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি শুয়ে পড়বো।
পড়ো আবৃত্তি করে—
সেদিন ৭ই মার্চে
ঝড় উঠেছিলো বাংলার আকাশে
ঝড়ের কাছে মাথা উঁচু করে রাখতে শিখলাম
সেদিন পশ্চিম দিগন্তে লাল সূর্য উঠেছিলো
লাল সূর্যের আলো আমাকে ছুঁয়ে গেলো
সেদিন ৭ই মার্চে সমুদ্রে গর্জন উঠেছিলো
বঙ্গবন্ধুর বজ্র কণ্ঠের শব্দে বাতাসে ও আগুন ঝরে
লাল সবুজ পতাকা হাতে উঠে এলো লাখ জনতা
চেতনা গভীর থেকে তর্জনী তুলে হুঙ্কার ছাড়লেন
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
সহস্র হাত উঠে গেলো তর্জনী তুলে
যুদ্ধে যাবার এখনি সময়
রক্ত মাখা পতাকা আমার শরীর জড়িয়ে গেলো
আমি আজও স্বাধীনতা খুঁজে বেড়াই
স্বাধীনতা! তোমার বুকে মাথা রেখে
নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারলাম না আজও।

পরশ কবিতাটা শেষ করে নিশ্চুপ থাকে। সারা ঘরে নীরবতা। পরশের চেখের সামনে ভেসে উঠে সেদিনের ঝাপসা স্মৃতি। দমকা হাওয়ায় নৌকা থেকে পড়ে

যাওয়া। তারপর সবুর মোল্লা ডুবে ডুবে কী করে পরশকে উদ্ধার করে!! এরপর আর কিছু ভাবতে পারে না। চোখের কোনায় চিক চিক করে উঠে। পাছে রনি, রবি টের পায়। উঠ যায় বাথরুমে। বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসে।

"দারুণ কবিতা শোনালে পরশ ভাইয়া।"

"দারুণ কবিতা তো শুনলি। এবার শুয়ে পড়। আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে।"

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লে ঝাপসা স্মৃতি পরশের চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠেছে। একমাত্র সবুর ও তার স্ত্রী ছাড়া কেউ জানে না পরশের দুঃখ গাঁথা। পৃথিবীর কেউ জানলো না-জানবে না স্বাধীনতার গায়ে ওর আপন জনের রক্তের সোদা গন্ধ। কান পেতে শুনতে পায় প্রিয় সে ডাক-"খোকা-খোকা দুধটুকু খেয়ে নে।"

পরশ ঘর্মাক্ত হচ্ছে। কষ্টের নদী বেয়ে সারা জীবন কী সাঁতরে সাঁতরে চলতে হবে?

পরশ এপাশ ওপাশ করতে করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ঘোরে দুটো ছায়া ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। "বাবা আমাদের দোয়া তোর উপর সব সময় আছে। তুই অনেক বড় হবি। তোর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। ধৈর্য্য ধর। সবুরের ফল আছে। আমরা তোর সঙ্গে আছি। তুই ভাল থাকিস।"

পরশ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠে বসে। এমন স্বপ্ন তো কোনদিন দেখেনি। পরশের দু চোখ বেয়ে পনি গড়িয়ে পড়ে। মনে মনে আকুতি কর "কোথায় তোমরা?" আমি যে আর কষ্ট বয়ে বেড়াতে পারছি না। তোমরা যেখানেই থাকো আমার সঙ্গে থেকো। মনের শক্তিটা দাও। তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো তোমাদের বুকের ধন চাপা কষ্ট নিয়ে সামনে পথ চলছে? সত্যটা জানতে দাও। বুকটা যে খাঁ খাঁ করছে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো? আমাকে পথ দেখাও। আলোর পথ।"

চোখের পানি মুছে পরশ শুয়ে পড়ে। মনে মনে বলে ভেঙ্গে পড়ার সময় নয় এখন। বাস্তবটাকে মেনে কঠিন পথ পাড়ি দিতেই হবে। এপাশ ওপাশ করতে পরশ ঘুমাতে চেষ্টা করে। মনে মনে বলে—

সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালবাসিলাম।

রনি, রবি স্কুলে যায় সকাল ৭টায়। পরশ একটু দেরী করে উঠে। বিছানায় বসে কাল রাতের স্বপ্নটা আচ্ছন্ন করে রাখে। এমন স্বপ্ন তো এর আগে দেখেনি। তবে কাল রাতে এমন স্বপ্ন দেখলো কেন? এক ঠায় বসেই থাকে পরশ।

পরশ-অ-পরশ। পরশকে ডাকতে ডাকতে সবুর ঘরে ঢোকে।

"কিরে পরশ কী করিস? কী ভাবছিস?"

সবুর কথা বলতে বলতে খাটের এক পাশে বসে।

"নাস্তা-ও-তো খেলি না। মন খারাপ?"

আরে নাহ্ বাবা মন খারাপ কেন হবে। আমাদের তো খুশির দিন। ভর্তির ঝামেলা চুকে গেছে। এখন তো খুশিতে থাকার কথা।"

"আমার ও খুশি লাগছে। নিশ্চিন্তে তোর সব ব্যবস্থা হয়ে গেলো। এবার ভাবছি কালই চলে যাই। ওদিকে অপুটা একা। একা একা দোকানটা সে কীভাবে সামলাচ্ছে। তোর মা-ও-বাড়িতে একা। কী বলিস?"

"সত্যিই বলছো বাবা। আমার ঝামেলা তো চুকে গেল। ক্লাস শুরু হবে আগামী মাসের দুই তারিখে। অবসরে পাবলিক লাইব্রেরিতে যাবো। সন্ধ্যায় রনি, রবিকে পড়াবো। নিজেও পড়বো। তা কবে যাবে?"

"ভাবছি কালই যাবো। রমিজকেও বলেছি সকালে। তোর জন্য একটা মোবাইল কেনার জন্য রমিজকে টাকা দিয়েছি। অপুর সঙ্গে যোগাযোগটা করা যাবে। আমি ও তোর মাও নিশ্চিন্তে থাকবো।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছো একটা মোবাইল হলে ভালই হয়।"

"মাঝে মাঝে স্যারের সঙ্গে দেখা করিস।" সে তুমি ভেব না বাবা। নিজের দায়িত্ব থেকে দেখা করবো। তুমি চিন্তা করো না।"

"চল নাস্তা খাবি।"

"তুমি যাও বাবা আমি হাত মুখটা ধুয়ে আসি।"

নাস্তার টেবিলে পরশ এসে বললো চাচী, সবুরও এসে বসে।

"সোনার টুকরো ছেলে পরশ। পরশের সঙ্গে থেকে রনি, রবি ও যদি এমন ভাল হয়। ভাইজান দোয়া করেন।"

"ওরা ও ভাল Result করে অনেক বড় হবে। পরশ যখন আছে তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি কাল চলে যাবো। পরশ রনি, রবি তোমার কাছেই রইলো। তুমি দেখো পরশের দেখাদেখি রনি, রবি বই ছাড়া কিছু বুঝবে না। ক্লাস শুরু হলে কলেজের অধ্যক্ষের বাসায় চলে যাবে। অধ্যক্ষ স্যার বোধ হয় পরশের সম্ভাবনার দিকটি দেখতে পেয়েছেন—সেজন্য নিজের কাছে রাখতে চান পরশকে। পরশ ও বাসায় থাকলেও রনি, রবিকে এসে পড়াবে। লাইব্রেরিতে পড়তে নিয়ে যাবে।"

"সে কী ভাইজান পরশ এ বাসায় থাকবে না?"

"এ বাসায় থাকলে আড্ডা ছাড়া কিছু হবে না। বরং সময় মতো পরশ ওদের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে যাবে। প্রয়োজনে লাইব্রেরিতে নিয়ে যাবে। অধ্যক্ষ স্যারের একমাত্র ছেলে বিদেশে পড়ালেখা করে। নিরিবিলিতে পরশ অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে পড়বে। বাসাটা একটা লাইব্রেরি বলা যায়। স্বয়ং অধ্যক্ষের বাসায় থাকবে। বাইরে বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডা মারতে পারবে না। আডডা যা মারার কলেজে মারবে। পরশের চেষ্টায় দেখবে রনি ও ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে পারবে দেখো।"

"স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দেখান। আমি সে আশায় বুক বেঁধে থাকবো।"

"তুমি কোন চিন্তা করো না তো। পরশের অজুহাতে রনি, রবি এমন কী অধ্যক্ষের পরিবারের একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। স্যারের স্ত্রীও খুব ভাল।"

"আপনিও কী গিয়েছিলেন ঐ বাসায়?

হ্যাঁ পরশের সঙ্গে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ হলো।

"সত্যি ভাইয়া একটা শুভ লক্ষণ। বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে পরশের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। শুনে আমার খুব ভাল লাগছে।

"তা...আমি এখন উঠি। কাল বাড়ি যাবো। বাড়ির জন্য টুকটাক কিছু কিনবো।"

"ঠিক আছে ভাইজান। দুপুরে বাসায় খাবেন? নাকি দু ভাই মিলে দোকানে। দোকানে খেলে কর্মচারী পাঠিয়ে দেবেন।"

"বাব্বা আমারে নিয়ে এতক্ষণ ধরে এক বড় বক্তৃতা দিয়ে দিলেন। সময়ের উপর ছেড়ে দিন না সব। সময়ই সব ঠিক করে দেবে। রনি যেন ভাল Result করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে পারে তা আমি দেখবো। আর রবির তো আরো দু বছর বাকি। ও গড়ে উঠবে ঠিক ভাবেই দেখো চাচী।"

তোরা বাপ বেটা মিলে আমাকে ভরসা দেখালি আল্লাহ্ যেন তাই করে। চাচী কথা বলতে বলতে টেবিল গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

"পরশ তুই কী অবসর? তোর বাবা তো বের হচ্ছেন?"

"হ্যাঁ অবসরই বলা যায়। কেন চাচী?"

"পরশের কানে কানে বলে রান্নাটা শেষ করেই তোকে নিয়ে বের হবো।"

"ইশারায় পরশ বলে কোথায়?"

"ফিস ফিস করে চাচী বলে আগে বের হইতো।"

পরশও ফিসফিস করে বলে আমি গেলাম। সময় মতো ডেকো।"

পরশ ঘরে চলে যায়।

"পরশ অ পরশ তৈরি?"

চাচী ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢোকে।

"জ্বি চাচী একবারে তৈরি। কোথায় যাবে বললে না তো?

"আগে বের হই তো।"

"চলো।"

পরশ চাচীকে নিয়ে বের হয়। একটু এগুতেই একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়ে।

"জান চাচী-জীবনের এ প্রথম ঢাকায় আসা। একদিনে ঢাকার কত কী দেখলাম।"

"থাকতে থাকতে আরো কত কী দেখবি। কত কী জানবি। এ জানায়, দেখায় তোর চোখ ঠিকরে আলো পড়বে। এ আলোয় সঠিক পথে পথ চলতে পারবি। তোকে নিয়ে আমাদের বড্ড আশা।"

"জানি না চাচী কোন বাঁকে পথ যায়। তবে আশা ঠিক পথটাই খুঁজে পাবো।"

এ আত্মবিশ্বাসের জন্যই তুই জীবনে ভালো করবি।

"এবার বল কোথায় যাবে। রিক্সাওয়ালাকে বলতে হবে না?"

"নিউ মার্কেটের হকার্স মার্কেটে।"

"রনি, রবিকে নিয়ে এভাবে বের হও?"

"হ্যাঁ মাঝে মধ্যে বের হই। ওরা যা চঞ্চল। তোর মতো শান্ত স্বভাবের তো নয়। টিভি দেখার পোক যাকে বলে।"

"তোর মত বই পোকা নয় ওরা।"

"আমি ওদের বই পাগল করে ছাড়বো দেখো।"

"তাই যেন হয় বাবা।"

রিক্সা এসে থামে হকার্স মার্কেটের সামনে। পরশ এই প্রথম দেখে। কত দোকান। কত ক্রেতা। দু পাশে দোকানের সামনে কত লোক! রাস্তায় রিক্সায় গাড়ি, সিএনজির ভিড়। পরশ যত দেখে তত চোখ ছানা বড় হয়ে যায়।

চাচীর পিছু পিছু এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঘুরে পরশ। চাচী শাড়ি, শার্ট, চুড়ি, কানের গলার ইমিটেশন জিনিস চুল বাঁধার ক্লিপ সেন্ডেল কিনে বেরিয়ে আসে।

তোমার জিনিস তুমিই কেনো?

"তোর চাচার সঙ্গেই আসা পড়ে বেশি। কখনও একা একা আসি। কেনরে?"

"নাহ্ এমনিতেই জানতে চাইলাম।"

"আজ যা কিনলাম তোর মাও অপুর জন্য সামান্য কিছু কিনলাম রে। কত দিন তোর মা অপুকে দেখিনি। শখ করে ওদের জন্য কিছু কিনলাম। ভাইজান কাল যাওয়ার সময় দিয়ে দেবো।"

পরশ মনে মনে ভাবে কবে বড় হবে, কবে চাকরি বা ব্যবসা করতে পারবে। সেদিন পরিবারের সবার জন্য প্রাণ ভরে কিনতে পারবে।

সি.এন.জি চলছে। পরশ চোখ মেলে দেখে অদেখা ঢাকা শহর আর জানতে চায় এ জায়গার নাম ইত্যাদি। চাচী ও বলে যায় এটি এলিফ্যান্ট রোড, এটি হাতির পুলবাজার, এটি ইস্টান প্লাজা ইত্যাদি।

বাসায় ফিরে পরশ গোসলটা সেরে নেয় গোসল সেরে বাইরে এসে চাচীকে ডাকে "চাচী ক্ষিধা পেয়েছে।"

আমারও। চল খাই।

চাচীর হাতের মুড়িঘন্ট আর মাছের চপ দিয়ে ধুমসে পেট ভরে খায় পরশ।

"খুব মজা হয়েছে চাচী মুড়িঘন্টটা। খুব খেলাম।" চাচী শুনে খুব খুশি হয়।

পরশ খেয়ে সোজা ঘরে চলে যায়। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে টেরই পায়নি।

বিকেলে রনি, রবি বাসায় ফিরে পরশকে ঘুমতে দেখে মহাখুশি। যাক পরশ ভাইয়া বাসায় আছে। দুই ভাই হাত মুখ ধুয়ে আবার ঘরে ফেরে পরশকে ডাকতে শুরু করে।

পরশ ভাইয়া ওঠো। আমরা কখন স্কুল থেকে ফিরে খাওয়া দাওয়া সারলাম।

পরশ উঠে বসে। "লক্ষ্মী ছেলেদের মতো স্কুল থেকে ফিরে খাওয়া দাওয়াও সেরে ফেলেছিস। তা আজ ক্লাসে অঙ্ক ঠিক মতো করেছিস?"

রনি বলে "পরশ ভাইয়া সে কটি অঙ্ক করতে দিয়েছে ক্লাসে সব কটি ঠিক ঠিক করেছি।"

রবি ও বলে "আমি কিন্তু সব কটা অঙ্ক ঠিক ঠিক করেছি।"

দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে পরশ। বলে—"দশম শ্রেণীতে উঠলি-এ একটা বছর ভাল করে পড়তে হবে। আমি তো আছি। কোন চিন্তা নেই।"

"পরশ ভাইয়া চল না বাইরে থেকে ঘুরে আসি।"

"রবির কথায় পরশ বলে "বাইরে কোথায় যাবি?" "ও দিকটাই মাঠে ক্রিকেট খেলা হয়। চলো না ভাইয়া। সামান্য খেলবো। ঠিক সময় বাসায় ফিরে পড়তে বসবো।

"হ্যাঁ খেলাধুলা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। চল যাই। দেখি তুই কেমন খেলিস।"

ওরা বেরিয়ে পড়ে। তোরা কোথায় যাচ্ছিস? চাচী পেছন থেকে ডাকে।

"একটু ঘুরে আসি। সন্ধ্যার আগেই ফিরবো। চিন্তা করো না।"

ওরা ক্রিকেট খেলার মাঠে চলে যায়। রনি, রবি ক্রিকেট খেলায় মেতে উঠে। পরশ বসে বসে দেখে। মনে মনে ভাবে গ্রামেও খেলার মাঠে ক্রিকেট খেলা হতো। স্কুলের মাঠেও। বন্ধুরা কতো ডাকতো খেলতে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ও মাঠে নামেনি। কারণ ওর ভয় ছিল খেলায় একবার পাগল হয়ে উঠলে হয়ে উঠলে ব্যাট আর উইকেটে স্বপ্নেই বিভোর থাকবে। মন দিয়ে পড়ালেখা পরশের একমাত্র লক্ষ্য। খেলা দেখে সময় মতো বাড়ি ফিরে আসতো। আজ বুঝতে পারছে রনি, রবির এ খেলার নেশা পেয়েছে। সে জন্য বাসায় ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরতো। স্কুলের পড়াটা কোন ক্রমে সেরে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়তো। খেলা দেখতে দেখতে পরশ ভাবে রনি, রবিকে বাসায় ফেরার সময় বেধে দেবে। তাও প্রতিদিন নয় বৃহস্পতি, শুক্র এবং অন্য যে কোন একদিন। সাতটার মধ্যে ওদের পড়ার টেবিলে বসতেই হবে। রুটিন বেঁধে দিতেই হবে। কাজটি করতে হবে আন্তরিকতার সাথে।

ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজতেই পরশ গলা ছেড়ে ডাকে দুজনকে। "তোরা না আসলে বাসায় চললুম।"

পরশের ডাকাকে অস্বীকার করতে পারে না রনি ও রবি। মাঠ চেড়ে এসে বলে "চলো।"

"কিরে খেলাধুলা করলেই কী চলবে? ভাল Resalt করতে হলে সময় মত পড়ার টেবিলে যেতে হবে। কাল থেকে সাড়ে ছটায় বাসায় ফিরবি। নাস্তা খেয়ে সাতটায় পড়ার টেবিলে। তোদের পড়াবো, আমিও পড়বো। দশটা পর্যন্ত পড়ার টেবিলে থাকা চাই। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে টিভি দেখবি। সময় মত ঘুমাতে আসবি। সকাল সাতটায় স্কুলে যেতে হয় জানিস তো? এর ব্যতিক্রম হলে আমি তোদের পড়াতে পারব না। চাচাকেই বলতে হবে সব।"

"না ভাইয়া বাবাকে বলো না কিছু। তুমি যা বলবে আমরা শুনবো।" "তুমি যখন আমাদের বাসায় থাকবে না। রাত দশটা পর্যন্ত আমাদের বাসায় থাকবে? স্যার রাগ করবেন না?"

"আরে বোকা আমার পড়ালেখা থাকবে না বুঝি? রাত দশটা পর্যন্ত থাকবো কীভাবে? তখন সাড়ে ছটায় আসবো। সাড়ে সাতটায় চলে যাবো। ক্লাসের অঙ্ক বিজ্ঞান বা অন্য বিষয় পড়াবো। পরের দিনের জন্য হোমটাস্ক দিয়ে যাবো। তোরা তা পরের দিন আমাকে বুঝিয়ে দিবি। তাছাড়া ক্লাস শুরু না হওয়া পর্যন্ত রুটিন-না দেখে এখন কিছু বলা যাবে না। তবে আমার কথা মতো চলতে হবে বলে দিলাম।"

"তোমাকে নিয়ে কী বেড়াতে যেতে পারবো না?" রনি কথাটা বলতেই পরশ জড়িয়ে ধরে রনিকে ...।

"আরে বোকা বেড়াতে যাবো না কেন? ছুটির দিনে সময় বুঝে সময় করে নেবো।" তবে যাই বলিস সামনে তোর মেট্রিক পরীক্ষা। এ একটা বছর মন দিয়ে পড়তে হবে ভাল Resalt না করলে ঢাকা কলেজে ভর্তি হবি কী করে।"

"ঠিক বলেছো ভাইয়া-আজ থেকে সিরিয়াস হয়ে যাবো। তোমাকে কথা দিলাম। দেখে নিও। শুধু তুমি আমাকে গাইড করো।"

"আমিও আজ থেকে সিরিয়াস হয়ে যাবো ভাইয়া।" রনি উচ্ছ্বাসে কথাটা বলে।

পরশ দুজনের কাঁধে হাত রাখে পরম স্নেহে।

"কিরে তোরা ফিরলি? হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে পড়তে যা।"

পরশ চোখের ইশারায় বলে "তাড়াতাড়ি কর।" লক্ষ্মী ছেলের মত দু ভাই হাত মুখ ধুয়ে মায়ের হাতের বানানো নাস্তা খায়। পরশও বসে ওদের সঙ্গে।

সবুর রমিজ বাসায় ফেরে রাত নটায়। "নাস্তা চা কিছু খাবে?" রমিজের স্ত্রী জানতে চায়।

নাহ্ একেবারে ভাতই খাবো। তা ... তোমার ছেলেরা কোথায় তো ঘরে ঢুকে দেখতাম টিভির সামনে। আজ যে কোন সাড়া শব্দ নেই?"

"পরশ ওদের নিয়ে পড়তে বসিয়েছে।"

'পরশের হাত পড়েছে তো আর ভেব না।"

সবুরের কথায় রমিজ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—"পরশ আছে এবার আমি নিশ্চিন্ত।

"হ্যাঁ আমিও" রমিজের স্ত্রীও সায় দিয়ে বলে।

রমিজের স্ত্রী আজ কী কী কিনলো সব দেখায় রমিজ ও সবুরকে।

"ওরে বাপরে এতো কিছু কিনতে গেলে কেন? বলতো আমিও তো বেশ কিছু কিনেছি।"

"ব্যাগটা গুছিয়ে ফেলুন। সকালে সময় পাবেন না।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছো—ব্যাগটা গুছিয়ে ফেলি। কাল সকাল সকাল রওনা হবো তো।"

"আপনি কী কিনেছেন পরশকে দেখাবেন না?"

রমিজের স্ত্রীর প্রশ্নে সবুর হেসে বলে—"পরশকে দেখাতে হবে না। মুখে বললেই হবে। কেনাকাটার ওর তেমন আগ্রহ নেই।"

রমিজ গোসল সেরে বসার ঘরে এসে বসে। "ভাইজান কী গোসল করবেন?"

"হ্যাঁ ব্যাগটা গুছিয়ে গোসলটা সেরেই ফেলি। দেখ না তোর বৌ কত কী কিনেছে তোর ভাবী ও অপুর জন্য।"

তুমি খুব ভাল করেছো গিন্নী। আমার তো এসব মাথায়ই ছিলো না।"

সবুর ব্যাগ গুছিয়ে গোসল সেরে বসার ঘরে এসে বসে। রাত দশটার মতো বাজে।

"দেখেছো আজ তোমার ছেলেরা পড়ার টেবিল ছেড়ে আসছে না এ সবই পরশের জন্য।"

"হ্যাঁ শুভ লক্ষণ। টেবিলে এবার খাওয়া দাও। তারপর ওদের ডাকো।

রমিজের স্ত্রী টেবিলে খাওয়া দিয়ে ছেলেদের ঘরে যায়।

"তোরা খাবিনে? তোদের বাপ চাচা অপেক্ষা করছে। পরশ বাবা তুমি ওদের নিয়ে এসো।"

খেতে খেতে রমিজ বলে—"তোরা সতিই লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেছিস। পরশ বেটা সত্যিই তোদের মানুষ করে ছাড়বে।"

"নাহ্ চাচা ওরা সত্যিই লক্ষ্মী ছেলে। ওদের নিয়ে ভাববেন না।"

ক্লাস শুরু হওয়ার কদিন আগে কলেজে অনেক খোঁজাখুঁজি করে কমার্স বিভাগের প্রধান সৌরভ চৌধুরীর রুম খুঁজে বের করে। ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢোকে পরশ। স্লামালাইকুম বলে সামনে দাঁড়ায়।

"কী চাই?"

"স্যার আমার নাম পরশ ইবনে মাহমুদ। অধ্যক্ষ স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। তাই এলাম স্যার।"

"পরশ, পরশ ওহ্ স্যার আমাকে তোমার কথা বলেছেন। মেধাবী ছাত্র তুমি। তাও বলেছেন। কমার্সে ভর্তি হয়েছো তো?" "কী বলবে বল।"

স্যার ক্লাস তো শুরু হবে কদিন পরেই। কী কী বই কিনতে হবে আমাকে যদি কটি বই-এর নাম বললে—আমি কিনে নিতাম।

"তুমি বই কিনতে চাও?"

"জ্বি।"

"ভাল Result করতে হলে ভাল রেফারেন্স ও লাগবে। তাছাড়া ক্লাস করতে তোমার ধারণা হয়ে যাবে শুধু বই আর রেফারেন্স হলেই হবে না। খাতায় নোট তৈরি করলে আরো ভাল।"

"স্যার আপাতত আমাকে বই আর কিছু রেফারেন্স বইএর কটা নাম দিন। ক্লাস করতে করতে আমারও কিছু ধারণা হয়ে যাবে।"

সৌরভ চৌধুরী একটা কাগজ কয়েকটি বইও রেফারেন্স বই এর নাম লিখে দিলেন। সাথে লেখকের নাম ও লিখে দিলেন।

"বইগুলো নিশ্চয়ই নিউমার্কেটে পাওয়া যাবে।"

"জ্বি স্যার আমি সেখানেই যাবো।"

হাত বাড়িয়ে স্যারের কাজ থেকে বই এর নাম লেখা কাগজটা নিয়ে সালাম জানিয়ে বেরিয়ে যেতেই পেছন থেকে স্যার ডাকেন

"শোন যে কোন প্রয়োজনে তুমি আমার কাছে আসতে পারো। সঙ্কোচ করো না।"

আসবো স্যার, নিশ্চয়ই আসবো। দোয়া করেন স্যার।"

আবার সালাম জানিয়ে ভদ্রভাবে বেরিয়ে পড়ে। ওর আর তর সইছিল না। কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যায় নিউ মার্কেটে। সারি সারি বই এর দোকান ঘুরে ঘুরে দেখে। সৌরভ চৌধুরীর দেয়া বই এর তালিকা দেখে কয়েক খানা বই কিনে নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যায় পাবলিক লাইব্রেরিতে। পাবলিক লাইব্রেরির সারি সারি বুক সেলফ রেফারেন্স এর কোন হদিস পেল না। না পাওয়ার কারণ সময়ের স্বল্পতা।

এর আগেও পর এ লাইব্রেরিতে এসেছিল। আজ না এল সব বুঝে উঠতে সময় লাগবে। এসবে এতো তাড়া করতে নেই। আসা যাওয়া করতে করতে সবই আয়ত্বে চলে আসবে। পরশের জীবনে পরম আনন্দের! ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই

অধ্যক্ষ বিভাগীয় প্রধানের সান্নিধ্যে আসা পরশ সৌভাগ্যের ব্যাপার। এসব ভাবতে ভাবতে পরশ বেরিয়ে পড়ে বাসার দিকে। বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। রনি রবিকে নিয়ে পড়ার টেবিলে বসতে হবে। দুদিন পরে ক্লাস শুরু হবে। নতুন রুটিন হাতে এসে সব ঠিক বুঝতে পারবে।

টেবিলে লক্ষ্মী হয়ে বসে পড়তো। আজ তোদের অংক করাব। তারপর অংক পরীক্ষা নেব। পরশ দু ভাইকে নিয়ে টেবিলে বসে। রনি রবি লক্ষ্মী ছেলের মতো পড়ার টেবিলে বসে। পরশ ওদের অংক করতে দিয়ে নিজের বইগুলো নিয়ে ধারণা নিতে চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে গম্ভীর সুরে তাগাদা দেয়।

"কি হলো? কটা অংক শেষ করেছিস?"

"করছি তো। তুমি আজ একেবারে মাস্টার হয়ে গেছো।"

"পড়ার টেবিলে বেমালুম মাস্টার। মনে থাকে যেন। অঙ্কে ভুল হলে শাস্তি।"

সারা ঘরে নিরবতা। সবাই পড়ার টেবিলে। রমিজ ঘরে ফিরে স্ত্রীকে ডাকে কিগো আজ ঘরটা এতো নিরব কেন? ওরা কোথায়"

"বেশ ভাল কথা। পরশ এসেছে–আমার ছেলেরা পড়ার টেবিলে না থেকে উপায় নেই।"

রমিজ কাপড় ছেড়ে বসার ঘরে বসে। টিভিটা অন করে টিভি দেখায় মন দেয়। রমিজের স্ত্রী ও পাশে বসে।

"মা মনি কৈ?"

ঘুমিয়ে পড়েছে।

"আপনি খাবেন না?

"ওরা পড়া শেষ করে আসুক। এক সঙ্গে খাবো।"

"দশটা তো বেজে গেলো। অন্যদিন তো পড়ার টেবিলে এতোক্ষণ থাকে না। পরশ বাবা নিশ্চয়ই ভাল করে ধরেছে।

রমিজ হো হো করে হেসে বলে "পরশের বদৌলতে ছেলে দুটো যদি এবার লেখাপড়ায় মন দেয়। টেবিলে খাবার দিয়ে ওদের ডাকো। খাওয়া সেরে না হয় আবার পড়ার টেবিলে বসবে। ডাক ও দেয়।"

রমিজ গিন্নী টেবিলে খাওয়া
দিয়ে ছেলেদের ঘরে ডাকে।

"তোরা খাবি না? বাবা যে অপেক্ষা করছে।"

দেখ না মা পরশ ভাইয়া স্কুলের সব পড়া শেষ না করে ছাড়ছে না।"

রমিজ গিন্ন পরশের পিঠে স্বস্নেহে হাত রেখে বলে "তোর চাচা সারাদিন খেটে এসেছে। তোদের ছাড়া খেতে চাইছে না। খাওয়া শেষ করে আবার ওদের নিয়ে বসিস। চল খেতে চল।"

ওরা খুশি মনে বেরিয়ে আসে।

ওদের দেখেই বুঝি আজ আসল মাস্টারের হাতে পড়েছে। কিরে পরশ তোর ছাত্ররা ঠিক মত পড়ালেখা করছে তো?

"অনেক ইংরেজিতে ওরা খুবই দুর্বল। সে আমি ঠিক করে দেবো। আপনি কোন চিন্তার করবেন না।"

"ওদের প্রাইভেট টিউটর কি যে পড়িয়ে যায়"

"প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াটা বুঝে নিতে হয়।"

"চল টেবিলে যাই।"

খেতে খেতে রমিজ বলে—

"তোর শিক্ষা পেয়ে আমার দু ছেলে ভাল ছাত্র হতে পারে। ক্লাস শুরু হলে সময়টা বের করতে পারবি তো? প্রাইভেট টিউটরকে কী বিদায় করে দেবো?"

"ক্লাস শুরু হলে বুঝতে পারবো কখন সময় করতে পারবেনা তাছাড়া ক্লাস শুরু হলে আমি তো অধ্যক্ষ স্যারের বাসায় উঠে যাবো। এটি আমার পরম সৌভাগ্য এখনি টিউটর বিদেয় করবেন না। আমি এসে এসে ওদের বাড়তি পড়া পড়িয়ে যাবো। একেবারে রনি রবিকে অংক ইংরেজি বিজ্ঞানের মাস্টার বানিয়ে দেবো। সেজন্য আমাকে কোন পারিশ্রমিক দিতে হবে না। দরকার হলে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেবো।

"সে কীরে তুই স্যারের বাসায় থাকবি?"

"হ্যাঁ চাচা স্যার আমাকে নিজেই বলেছেন। তাই আমার জন্য পরম সৌভাগ্য। স্যারের তত্ত্বাবধানে থাকলে আমার ও অনেক সুবিধা। রনি রবির কথা আমার মাথায় আছে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।"

"আমি খুশি হয়েছি তুই স্বয়ং স্যারের বাসায় থাকবি। গ্রামে কত কষ্ট করে পড়েছিস।নিজের চেষ্টায় ভাল Result করেছিস। স্যারের বাসায় থাকলে তোর লেখাপড়া যে খুব ভাল হবে—সে বুঝতে পারছি। তোর জন্য আমাদের সকলের দোয়া রইলো। রনি রবিকে তোরই হাতে তুলে দিলাম। রনির মেট্রিক পরীক্ষা সামনে। আমি চাই ও ভাল Result করে তোর মত নিজ গুণে ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে পারে।"

"আমার চেষ্টা তো থাকবে চাচা। তবে নিজ চেষ্টা বড় চেষ্টা কী বলিস রনি?"

"তা... তোর হাতে টাকা পয়সা আছে তো?"

"বাবা বাড়ি যাওয়ার সময় কিছু দিয়ে গেছে।"

"কাল দুপুরে দোকানে আসিস।"

"জ্বি আচ্ছা।"

"ক্লাস শুরু কবে?"

"আর চারদিন পর।"

"সেদিনই কী স্যারের বাসায় উঠে যাবি?"

"স্যারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করবো।"

"তোকে একদিন আমার শ্রমিক লীগের অফিসে নিয়ে যাবো।"

"চাচা তুমি তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলে। গর্ব হয় না তোমার?"

"গর্ব মানে? এ গর্ব—যে কতটা কাউকেই বোঝাতে পারবো না।" গ্রামে গঞ্জে-ও-তো কত মুক্তিযোদ্ধা আছে। শ্রমিক কৃষক মজুর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শ্রমিক লীগ থেকে কিছু করেছো?"

"শ্রমিক লীগ করি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। শ্রমিকদের জন্য কতটুকু করতে পেরেছি জানি না। আর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলছিস? কিছুই করতে পারিনি। তোর বাবাকে দেখ না—যেমন কপাল তেমনই রয়ে গেছে। জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ওর অবদান কে মনে রেখেছে বল?"

"কেন হলো না, কেন হচ্ছে না?"

"সে দীর্ঘ ইতিহাস '৭৫ এ জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটাই মুছে গেল। সামরিক শাসন, স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। রাজনীতির চাকা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। সে অনেক কথা।"

"চাচা আপনার কাছে শুনবো '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা।"

"ঠিক আছে বলবো। ফাঁক পেয়ে মুক্তি যুদ্ধের উপর বই পড়বি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন গাঁথা পড়বি। তুই নিজে-ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ায় তোদের মতো প্রজন্মের হাতে। বঙ্গবন্ধুর আসল সৈনিক হয়ে সোনার বাংলা গড়বি—এ প্রত্যাশা গোটা জাতির। রাত হয়েছে অনেক। তোরা ঘরে যা।"

সবাই নীরবে উঠে যায়।

ঘরে ফিরে রনি বলে—

"সন্ধ্যার পর থেকে পড়ার টেবিলে। তারপর খাওয়ার টেবিলে খাওয়া আর চাচা ভাতিজার আড্ডা। আজ গল্প করারও সময় পেলাম না। তা পরশ ভাইয়া আজ সারাদিন কী করলে?"

"নিউ মার্কেটে বই কিনতে গেলাম। পাবলিক লাইব্রেরিতে গেলাম। তারপর সোজা বাড়ি—আর তোদের পড়ান।"

"আচ্ছা পরশ ভাইয়া তুমি ঢাকা কলেজের সেরা হতে চাও?"

রনির কথায় পরশ শব্দ করে হেসে বলে—"জীবনে কে—না—সেরা হতে চায়। তোরা বড় হতে চাস না?"

"হ্যাঁ চাই। তবে তোমার মত অত মেধাবী নইতো।"

"মেধা নিয়ে কেউ জন্মায় না। নিজের চেষ্টায় তা হতে হয় নিজের চেষ্টা না থাকলে অন্যের চেষ্টায় কতটুকু এগুনো যায়। তোরা এখন থেকে নিজে চেষ্টা করবি। সন্ধ্যার আগেই খেলার মাঠ থেকে বাসায় ফিরবি। খেতে চাইলে কিছু খেয়ে সোজা পড়ার টেবিল। নিজে নিজে পড়াটা পড়ে নিবি। যেখানে আটকে যাবি—আমার জন্য তুলে রাখবি তোদের আমি পড়ুয়া বানিয়ে ছাড়বো।"

রবি বলে অন্য কথা।

"আচ্ছা পরশ ভাইয়া সিনেমা হলে সিনেমা দেখেছো?"

"নাহ্?"

তবে চলো না তোমার ক্লাস শুরু হবার আগে একটা ভাল সিনেমা দেখে আসি।"

"ঠিক আছে যাবো।"

রবি আনন্দে পরশকে জড়িয়ে ধরে। পরশ খিলখিল হেসে উঠে। বলে রাত কটা বাজে? ঘুমাবি নাকি আরো গল্প। কাল তোদের স্কুল মনে আছে তো?

তিন জনই বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

"এই শোন চুপচাপ স্কুলে যাবি। আমি প্রাণ ভরে ঘুমবো।"

"ঠিক আছে" রবি বলল।

সকাল দশটা নাগাদ পরশ ঘুম থেকে উঠে। গোসল সেরে সোজা চলে আসে খাওয়ার টেবিলের কাছে।

চাচী-অ-চাচী গলা ছেড়ে ডাকে চাচীকে রমিজ গিন্নী রান্না ঘর থেকে ছুটে আসে।

"বাবা একটু অপেক্ষা করো তোমার পরাটা আর ডিমটা করে আনি।"

পরশ পত্রিকাটা নিয়ে খাওয়ার টেবিলেই বসে। মনোযোগ দিয়ে পত্রিকাটা পড়ে। রমিজ গিন্নী পরটা ডিম আর চা নিয়ে পরশের পাশে বসে। "নাও খাও বাবা। পায়েস আছে দেবো বাবা?" "নাহ্ চাচী পরটা ডিমেই পেট ভরে যাবে।"

"গ্রাম ছেড়ে শহরে জীবন কেমন লাগছে?"

খেতে খেতে জবাব দেয় পরশ—"গ্রামের মানুষ খুব সরল। নদীনালা খাল পুকুর নৌকা মাঝি মাল্লা সবুজে ঘেরা। শহরের মানুষ তো এখনও চেনা হয়ে উঠেনি। যাদের চিনেছি তারা সত্যই খুব ভাল মানুষ। ঢাকার যানজটটাই বিরক্তি জনক। দেখতে দেখতে সয়ে যাবে।"

"সত্যি বলেছো যানজটটা বড্ডই বিরক্তিজনক। রাজধানী শহর তো।"

"সবে তো এলি। আরো কত কিছু দেখবি, জানবি।"

আচ্ছা চাচী তুমি কী চাচার সঙ্গে শ্রমিক লীগের অফিসে গেছো?"

"হ্যাঁ গেছি কত বার। মিটিং মিছিলে ও গেছি। তোর চাচা খুব ভাল বক্তৃতা দেয়রে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কী সুন্দর বলে।"

"আজ চাচা আমাকে শ্রমিক লীগের অফিসে নিয়ে যাবে।"

"যা যা। তোর খুব ভাল লাগবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান তুই। তোর ভেতরে অন্য রকম অনুভূতি হবে।"

"আর ... মুক্তি সন্তান। এ সব খবর কে রাখে। সারাদেশে কজন মুক্তিযোদ্ধা আছে। কী হালে আছে কেউ কী জানে?"

রমিজ গিন্নী পরশের পিঠে সস্নেহে হাত রেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। ছেলেটার ভেতরে কী মেঘ জমে আছে কেবল ও-ই জানে।

"চাচী আমি তৈরি হই? চাচার দোকানে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ তৈরি হয়ে নে। আর শোন দুপুরে দোকানের কর্মচারীকে পাঠাতে বলিস। তোদের দুজনের খাবার দিয়ে দেবো। কখন ফিরবি?"

জানি না। রনি, রবি এলে লক্ষ্মী ছেলের মত পড়তে বসতে বলো। আমি এসে ওদের পড়া দেখবো।"

"রনি, রবি পড়ার ব্যাপারে তোকে ভয় করে। ওরা সময় মত ঠিক ঠিক পড়তে বসবে। তুই যা যা বললি বলবো ওদের।

"চাচী এবার উঠি। তৈরি হয়ে দোকানের দিকে যাই।"

পরশ ঝটপট তৈরি হয়ে রমিজের দোকানের দিকে তৈরি হয় রিক্সা না নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চারপাশ দেখতে দেখতে দোকানে পৌছে যায়। রমিজ কাজে ব্যস্ত ছিল পরশকে দেখে কাছে টেনে নেয়।

"কিরে নাস্তা পানি খাওয়া হয়েছে?"

"জ্বি চাচা চাচী খুব যত্ন করে নাস্তা খাইয়েছে। কাউকেই বাসায় পাঠাতে দুপুরের খাবার অনার জন্য।"

"ঠিক আছে। তুই ঘুরে ফিরে দ্যাখ। দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়বো।

"চাচা এতো বড় দোকান সামলিয়ে সংগঠনে কীভাবে সময় দেন?"

দোকানে কর্মচারীরা আছে। খুব বিশ্বস্ত। আমি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সময় দিয়ে লীগের অফিসে যাই।

"স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত শ্রমিকদের কতটা উন্নতি হয়েছে? চাচা?"

"শ্রমিকের সংখ্যা তো দিন দিন বাড়ছে। কলকারখানা ফ্যাক্টরি বাড়ছে। সমস্যার সমাধান যে হচ্ছে না তা নয়। হচ্ছে হবে।"

আমি রাজনীতি বুঝি না। শুধু বুঝি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। বুঝি মুক্তিযুদ্ধ। '৭৫ এ জাতির পিতার সপরিবারে হত্যা দেশের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতির পূরণ করতে পারবে এক মাত্র শেখ হাসিনাই।"

ঠিক বলেছিস। তাঁর হাতকে শক্তিশালী করতে হলে তোদের মত প্রজন্মেরই দরকার। গ্রাম থেকে এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছিস। চোখ কান খোলা রেখে চলবি।"

"তা আমি আগেই ভেবে রেখেছি। আমার বুকে মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধু এ আদর্শকে নিয়েই আমার সামনে পথ চলা।"

"তুই শত হলে-ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান।"

"চাচা মুক্তিযোদ্ধা, তাদের সন্তানদের রাষ্ট্র কতটুকু স্মরণে রেখেছে? বা ধর ত্রিশ লাখ শহীদ? তাদের নাম ঠিকানা নিয়ে কী কোন তালিকা প্রণীত হয়েছে? এসব কথা ভাবলে মনটা ভারী হয়ে যায়। বুকের কষ্ট বুকেই চেপে রাখি।"

রমিজ বুঝতে পারে পরশের কষ্ট। পরশের যে কিছু মনে নেই তা হতেই পারে না। কিন্তু পরশ বড় হওয়া অবধি এ নিয়ে কোন কিছুই আলাপে আনেনি। পরশ নিজেও কিছু বলেনি। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুধু লেখাপড়াই করেছে। আজ পরশ বড় হয়েছে খোলামেলা জানতে চাইতে পারে। কিন্তু সে এদিকটা এড়িয়েই চলে। মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠলেই ওর মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায়।

"বাবা পরশ, হতাশের কিছু নেই। তোদের মত প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যৎ। সোনার মানুষ হলেই দেশ হবে সোনার দেশ।" পরশ ইচ্ছে করেই কথা না বাড়িয়ে পত্রিকা পড়ায় মন দেয়। রমিজ বুঝতে পারে। পরশের পিঠে হাত রেখে বলে— "চল বের হই।"

দুজনে বেরিয়ে পড়ে।

রিক্সায় যেতে যেতে রমিজ বলে—

"পরশ।"

"জ্বি চাচা।"

"কবে উঠছিস স্যারের বাসায়?"

"কাল স্যারের সঙ্গে দেখা করবো। স্যার কী বলে শুনি।"

"রনি, রবিকে সময় দিতে পারবি তো?"

"আগে ক্লাসের রুটিন পাই। ঠিক এ মুহূর্তে ওদের টিউটর ছাড়িওনা উনি ভালই পড়ান। বাকিটা সময় আমি আমার মতই দেবো তুমি কোন চিন্তা করো না।"

"স্লামালাইকুম স্যার, আসবো?"

"এসো এসো পরশ। একদিন কী করলে। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

"আপনার কথা মত সৌরভ স্যারের সঙ্গে দেখা করেছি। স্যার আমাকে কিছু বই এর নাম দিলেন। আমি নিউ মার্কেট থেকে ক'খানা বই কিনলাম। পাবলিক লাইব্রেরিতে কিছু রেফারেন্স বই খুঁজে বের করে দেখে নিলাম। আমার দুই চাচাত ভাই আছে। সন্ধ্যায় ওদের নিয়ে একটু বসি।"

"কোন ক্লাসে পড়ে ওরা?"

"একজন এবার মেট্রিক দেবে। অন্যজন অষ্টম শ্রেণীতে। ওদের শুধু অংক ইংরেজীটাই পড়াই।"

"তোমার চাচা কী করেন?"

"শ্রমিক লীগের যুগ্ম সম্পাদক। তাছাড়া কাঠের দোকান আছে। দোকান থাকলে কী হবে লীগ নিয়েই পড়ে থাকে।"

আমার বাসায় কবে আসছো? বনফুল তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে। হাতে টাকা পয়সা আছে তো?"

"আছে কিছু স্যার। বাবা বলেছেন ক্লাস শুরু হলে টাকা পাঠাবেন তততোদিন চলে যাবে।"

"আগামী মাস থেকে পুয়র ফান্ড থেকে তুমি বিশেষ বৃত্তি পাচ্ছো। বই কেনার জন্য ও কিছু পাবে।"

"স্যার আপনার দয়া।"

"দয়া কিসের। এটি কলেজের নিয়ম। কাল ক্লাস শেষ করে একবার দেখা করে যেও।"

"আন্টি কেমন আছেন? আমার সালাম দেবেন তাঁকে।"

"আচ্ছা বলবো ওকে। কাল বলে যেও কবে আসছো বাসায়।"

"এবার আমি আসি স্যার।"

"এসো।"

অধ্যাপক সৌরভ চৌধুরীর সাহস করে ঢুকে সালাম জানিয়ে পাশে দাঁড়ায়।

"কেমন আছো?"

"ভাল স্যার। আপনি যে বইগুলোর নাম দিয়েছিলেন নিউ মার্কেট থেকে কটা বই আপাতত কিনেছি। পাবলিক লাইব্রেরিতে রেফারেন্স কিছু বই ও পেয়েছি। কিছু পড়েছি ও কাল ক্লাস শুরু। কিন্তু স্যার রুটিনটা কোথায় পাব?" সৌরভ চৌধুরী ফাইল থেকে রুটিনটা হাতে দিয়ে বললেন—"সব ক্লাস তো এক রুমে হবে না। বিষয়ের পাশে রুম নাম্বার লেখা আছে, কোন পিরিয়ডে কোন শিক্ষক ক্লাস নেবে তাও আছে। রুমগুলো আজই চিনে যাও। ক্লাসে কখনও ফাঁকি দিও না। যেকোন প্রয়োজনে তুমি চলে এসো।"

আবেগে পরশের চোখ ছলছল করে উঠে। সৌরভ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারে। কাছে টেনে নেয় পরশকে। পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলে "গ্রাম থেকে এসেছ তো কোন ভয় নেই। অধ্যক্ষ স্যারের বিশেষ নজর আছে তোমার উপর। নইলে কী স্বয়ং তাঁর বাসায় যেতে বলতেন। অবশ্য স্যার খুব উদার মনের মানুষ। অনেক ছাত্ররাই তাঁর বাসায় থেকে তার তত্ত্বাবধানে ভাল Result করে আজ অনেক বড় হয়েছে। তুমি সে সৌভাগ্যবানদের একজন। আমি আশা করি তুমি খুব ভাল করবে অর্থাৎ সেরা ফল করবে।" দোয়া করবেন স্যার বলেই সৌরভ চৌধুরীর পা ছুঁয়ে সালাম করতেই তিনি উঠে দাঁড়ান "একি একি সালাম কেন?"

"স্যার দোয়া নিলাম।"

পরশ রুটিনটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। রুটিন খুঁজে রুম নাম্বারগুলো চিনে নেয়। দীর্ঘ সময় কাটিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে শাহাবাগের একটি স্ন্যাক্সের দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে নেয়।

পায়ে হেঁটেই বাসায় ফিরলো তিনটে নাগাদ।

"কিরে ফিরলি? খাবি তো?

গোসলটা সেরে আসি চাচী। এর মধ্যে রনি, রবি ফিরে আসবে এক সঙ্গে খাবো।

ঠিক আছে যা। ওদের ও আসার সময় হয়ে গেছে।

তিন ভাই টেবিলে খেতে খেতে জমসে আড্ডা। খেলা থেকে রাজনীতি, রাজনীতি থেকে সন্ত্রাস, যানজট। "চাচা তো তোদের জন্য কম্পিউটার কিনে দিয়েছে। কী শিখেছিস? ইন্টারনেট দেখতে পারিস?"

রনি বলে "কম্পিউটার আমরা ভাল পারি। ইন্টারনেটটা তেমন রপ্ত হয়নি। আমাদের ভাল করে দেখিয়ে দিও কিন্তু।"

"ঠিক আছে রাতে বসবো কিন্তু। পরশু তো স্যারের বাসায় চলো যাবো।"

"সেকি? তুমি চলে গেলে আমাদের পড়া?"

"হবে হবে। সে চিন্তা করিস না। তবে খেলার সময়টা কমিয়ে দিতে হবে কিন্তু।"

"আমরা খেলব না বুঝি?"

"রনির মেট্রিক পরীক্ষা সামনে। ওকে ছটার মধ্যে পড়ার টেবিলে চাই। রাত ১২/১টা পর্যন্ত।"

"পরশ ভাইয়া তুমি যে ভাবে বলবে আমি সে ভাবেই চলবো। তোমার মত আমার ও ঢাকা কলেজে ভর্তি হতেই হবে। তুমি কোন চিন্তা করো না।"

আড্ডা মারতে খেলার মাঠে যাওয়ার ও সময় শেষ। কিছুক্ষণ টিভি দেখে পরশের কথা মত পড়ার টেবিলে এসে বসে। পরশ যত্ন সহকারে রনির অঙ্ক বইটা নিয়ে বেশ কটি অঙ্ক করতে দেয়। রবির স্কুলের পড়া শেষ করতে বলে পরশ নিজের বই নিয়ে বসে। ক্লাসের রুটিনটা খাতায় টুকে রাখে।

রমিজ গিন্নী মনে মনে ভাবে এ বাসায় এতো তাড়াতাড়ি পড়ার পরিবেশটাই ছিল না। ভাগ্যিস পরশ এসেছে। ছেলেটা যদি এ বাসায় থাকতো কী ভালই হতো। তা কী-ই বা করার আছে এটুকুন রুমে এ খাটে তিনজনের গাদাগাদি করে শোয়া। পরশ

হয়ত রাত জেগে পড়বে রনি, রবির অসুবিধাও হতে পারে। স্কুলে যাওয়ার জন্য অকাল সাতটায় উঠতে হয়। রমিজ গিন্নী এসব ভাবতে ভাবতে রাতের রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রমিজ ঘরে ঢুকেই মেয়েকে ডাকে। ছোট তুরিন ছুটে আসে।

"বাবা তোমার কাছে নালিশ আছে।"

"কী নালিশ মা?"

পরশ ভাইয়া ভাইয়াদের পড়ায়। আমাকে পড়ায় না কেন। আমার "বুঝি ভাল ছাত্রী হতে ইচ্ছে করে না?"

"সাবাস মা তোর এ ইচ্ছাটাই তোকে অনেক বড় করবে।" পরশ অ পরশ ... রমিজ গলা ছেড়ে ডাকে রমিজ।

"জ্বি চাচা ডেকেছেন?"

"রুহিন কী বলে শোন।"

"কী বলে?"

তুই রনি, রবিকে পড়াস। রুহিনকে কেন পড়াস না। ওর-ও-তো ভাল ছাত্রী হতে চায়।

পরশ হো হো করে হেসে রুহিনকে জড়িয়ে বলে—"ভাল ছাত্রী হতে চাস—এ স্বপ্ন তোর বয়সে কজনে দেখে? এ বয়সে পুতুল খেলার স্বপ্ন দেখে। আমি সত্যই খুব খুশি হয়েছি তোর এমন ইচ্ছার কথা শুনে। আমি তো আছি ঢাকাতেই। আরেকটু উপরের ক্লাসে ওঠ আমি অবশ্যই তোকে পড়াব। রনি তো মেট্রিক দেবে ওর প্রতি একটু ভিন্ন নজর রাখা ভাল নয় কী?"

"তবে কবে থেকে আমাকে পড়াবে বল?"

"আমার ক্লাস তো কাল থেকে শুরু। ক্লাসটা শুরু করি-তারপর বলবো। তবে কথা দিলাম তোর ফাইনাল পরীক্ষার আগে তোকে সব বিষয়ে সর্বোচ্চ নাম্বার পাইয়ে দেবো। গল্পের বই পড়িস?"

"বাবা কিনে দিলে তো পড়বো।"

"ঠিক আছে আমি-ই তোর জন্য গল্পের বই কিনে আনবো পড়তে হবে কিন্তু। আজ স্কুলের পড়া শেষ করেছিস?"

"স্কুলের Home work সব শেষ।"

"এইতো লক্ষ্মী মেয়ে রুহিন।"

রুহিন টিভি দেখায় মন দেয়।

রমিজ তাকায় পরশের দিকে—"আজ কলেজে গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ গিয়েছিলাম। ক্লাস রুটিন নিয়ে এসেছি। বাপরে বাপ পর পর অনেক ক্লাস।"

"তোর অধ্যক্ষ স্যারের সঙ্গে দেখা করেছিস?"

"জ্বি চাচা করেছি।"

"কী বললেন?"

"বললেন পরশু দিন শুক্রবার। যেন সকাল সকাল সেদিনই স্যারের বাসায় চলে যাই। স্যার চান বছরের শুরুতেই সিরিয়াসলি পড়ালেখাটা করি। তাই ভাবছি চাচা

আমি পরশুদিন চলে যাই। রনি, রবিকে নিয়ে ভাববেন না। যতটা গাইড করার আমি করবো। ওদের টিউটরগুলো ভাল। তাদের ছাড়বেন না।"

ভাইজান বড় আশা করে তোকে ঢাকা কলেজে ভর্তি করেছে। গ্রামেও শত অভাব অনটনে বুক আগলে তোকে মানুষ করেছে। সে তুলনায় আমি তোর জন্য কিছুই করতে পারিনি। রাজনীতির চাকায় আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে গেছি। ছেলে দুটির দিকে খেয়াল ও করতে পারি না। তবে তুই ঠিকই বলেছিস ওদের টিউটর দুজনই খুব ভাল। বুয়েটের মেধাবী ছাত্র।"

"চল খেতে বসি। রনি, রবিকে ডেকে আন।" রমিজ উঠে যায় খাওয়ার টেবিলে। পরশ রনি, রবি ও আসে। রমিজ দু ছেলেও পরশকে বসতে বলে।

"তোরা পড়ালেখায় ভাল মন দিয়েছিস। খুব ভাল।" রমিজের কথায় রনি হাসতে হাসতে বলে—"আগে বুঝি পড়ালেখায় মন দেইনি? বলতে পারো পরশ ভাইয়া আসার পর চাপটা একটু বেড়েছে। এতে আমাদেরই লাভ হচ্ছে। পরশ ভাইয়া তো পরশুদিন চলে যাবে। যাওয়ার আগে নাকি এক গাদা পড়া দিয়ে যাবে। যখন সময় পাবে এসে দেখে যাবে।"

"যাক পরশ আছে বলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি।"

"চাচা যে কী বলেন আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব থেকেই যা ওদের জন্য ভাল তা করবো।"

"তোরও কিন্তু দায়িত্বটা অনেক বাড়লো। ঢাকা কলেজের সেরা ছাত্র হওয়ার স্বপ্ন দেখি তোকে নিয়ে।"

"দোয়া করবেন চাচা।"

"চাচীর দোয়া চাইলি না যে?" রমিজ গিন্নী খাবার পরিবেশন করতে করতে পরশকে বলে।

চাচী যে কী বলেন আপনার আর চাচার দোয়ার কথাই আমি বলছিলাম।"

"কাল কখন তোর ক্লাস শুরু?"

রমিজ গিন্নীর প্রশ্নের পরশ বলে সকাল সাড়ে আটটায়।

সাতটায় রনি, রবির সঙ্গে নাস্তা খেয়ে সাড়ে আটটায় বের হবো।"

"তার মানে আমরা তিন ভাই কি সঙ্গেই বের হবো। কী মজা"

"কেন? আমিও তো সাড়ে সাতটায় বের হই।" রুহিন অভিমানে বলে।

"আরে ছোট গিন্নী তো স্কুলে যায় বড় গিন্নীর হাত ধরে। তাতো ভুলে গেছি।" রনি রসিকতার সঙ্গে বললে সবাই হেসে উঠে।

"তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে। খাওয়া সেরে অপেক্ষা করিস।"

"আচ্ছা চাচা।"

খাওয়া সেরে যে যার ঘরে চলে যায়। পরশ বসার ঘরে টিভি অন করে রমিজের জন্য অপেক্ষা করে। মনে মনে ভাবে কী কথা বলবেন চাচা? আড়াল করা সত্যটা তো সবার কাছে আড়াল হয়ে আছে। চাচা আবার আড়াল করা সূতোটা ধরে টান দেবেন নাকি? মাথাটা টনটন করে ওঠে পরশের। একটা কবিতার কটি লাইন মনে মনে আওড়াতে শুরু করলে—

"এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে
সমুদ্র আমাকে তাড়া করছে

আমি দ্রুত পালাতে চাই
সমুদ্রের গর্জন থেকে নিজকে বাঁচাতে চাই"

রমিজ এসে পাশে বসে। "খুব টেনশন হচ্ছে বুঝি? কলেজের প্রথম ক্লাস।" পরশের পিঠে হাত রাখে রমিজ। পরশের ভেতরটা তখনও কাঁপছে।

কম্পিত কণ্ঠেই পরশ জবাব দেয় নাহ্ চাচা আমার কোন টেনশনই হচ্ছে না। কয়েকবার ঢাকা কলেজে ঘুরে দেখে ভয়টা কেটে গেছে।"

"খুব ভাল কথা।"

চাচা কী শুধু এ কথা বলার জন্য বসতে বলেছিলেন? পরশের চিন্তা দূর হয় না।

রমিজ একটা খাম পরশের হাতে দিয়ে বলে—"ছোট থেকে ভাইজানই তোকে কোলে পিঠে বড় করেছে। আমি তো কিছুই করতে পারিনি তোর জন্য। খামে কিছু টাকা আছে। তোর প্রয়োজনীয় জিনিস গুলো কাল কিনে নিবি। আর শোন-যখন যা দরকার হবে বিনা দ্বিধায় আমাকে বলবি।"

"চাচা এখন খামটা দেবার কী দরকার ছিল। আমার প্রয়োজন হলে আমিই বলবো।"

"নে ধরতো। একটা আমার আশীর্বাদ।"

পরশ খামটা নিয়ে রমিজকে সালাম করে "কাল সাড়ে সাতটায় বের হবো। আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।"

"কাল রাতে ফিরতে আমার অনেক রাত হবে। হয়ত দেখা হবে না। পরশুদিন যাওয়ার সময় যদি দেখা হয় ভাল। নইলে অন্যদিন দেখা করে যাস। স্যারের বাসায় ভালভাবে থাকিস। আমি জানি তোর মত ছেলে সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে। স্যার তোর জীবনে বড় আশীর্বাদ।"

কথা সেরে পরশ উঠে যায়।

"কিরে আবার পড়ার টেবিলে? পাঠ্য বই নয় ভাইয়া। গল্পের বই। তুমি বলেছিলে না সময় পেলে ভাল লেখকের বই পড়বি। তাই স্কুল লাইব্রেরি থেকে দুটো বই এনেছি।"

"বাহ্ চমৎকার। দেখি কী বই এনেছিস?"

শওকত ওসমানের 'জননী।'

জহির রায়হানের 'বরফ গলা নদী'।

"চমৎকার বই। পড়া শেষ হলে কেমন লাগলো আমাকে বলিস তোরা পড়। আমি আমার ব্যাগটা গুছিয়ে ফেলি। ক্লাশের খাতা পত্রগুলো ও গুছিয়ে ফেলি সে ফাঁকে। কাল সকাল সাতটায় নাস্তা খেয়ে আমাদের সবাইকে বের হতে হবে। তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হবে কিন্তু।"

"পরশ ভাইয়া একটা কথা বলবো?"

"রনির প্রশ্নে এতো ভনিতা না করে বলে ফেল কী বলবি।"

"আজ তোমার গোছানোর কাজ সেরে দু কি তিনটে কবিতা শোনাবে- আর ... কাল বিকেলে বেড়াতে যাবো। কাল স্যার পড়াতে আসবে না।

"উপন্যাস পড়তে বসে কবিতায় মন গেল যে?"

উপন্যাস তো আজই শেষ হবে না। শেষ করতে তো সময় লাগবে তোমাকে তো আগামী কাল রাতের পাব না। শোনাও না পরশ ভাইয়া।"

"ব্যাগ গুছাচ্ছি। কবিতা মাথায় আসবে না রে।"

"তুমি ব্যাগ গোছানোর বাকি কাজটা কাল রাতে করো। আমরা সাহায্য করবো। আবৃত্তির ঢঙে তোমার কবিতা শুনতে বড্ড ভাল লাগে।

"আমি আবৃত্তিকার নই। সব কবিতা মুখস্ত নেই। আগামী মাসে হাতে টাকা আসলে ভাবছি সঞ্চয়িতা, জীবনানন্দ দাস ও মুক্তিযুদ্ধের উপর কবিতার বই কিনবো। তখন শোনাবো।"

দ্যাখ যা-ই-মনে পড়ে শোনাও না দুটো কবিতা Please.

"আচ্ছা শোন—"

বাইগার নদী ঘেঁষে
টুঙ্গী পাড়ায় তোমার জন্ম
তোমার জন্মেই 'ওয়া' শব্দে
টুঙ্গীপাড়ার বাতাসে উল্লাস
এ শব্দ সাধারণ নয়
অসাধারণত্বে এ শব্দে উচ্চারিত হলো—
রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেবো
তোমার দু'চোখে পদ্মরাগ
কপালে বাংলার কবিতা
হৃদয়ে সোনার বাংলার ছবি।
ক্ষণজন্ম হে জাতির পিতা
তোমার জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না
তুমি আছো বাংলার হৃদয় জুড়ে
আজ তোমার জন্মদিনে
পত্র পল্লবে নৃত্যের খেলা চলছে
৩২ নাম্বারের লেকে আনন্দের ঢেউ
মানুষের চেতনার অলিন্দে অলিন্দে দৃপ্ত শপথ জাগে
তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বই মোরা।

"কার কবিতা পরশ ভাইয়া?" দু ভাইয়ের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইলেও পারলো না। ওদের দাবীর মুখে বলেই ফেললো পরশ—"একজন অকবির কবিতা।"

"Oh my God!! তোমার কবিতা? তুমি কবিতা লিখো?"

নারে কবিতার মতো কঠিন বিষয় সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কলমের আঁচড়ে আবোল তাবোল যা চলে আসে মাঝে মধ্যে তাই লিখি। এটি একেবারে আমার নিজস্ব ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমাকে আর কিছু বলবিনে। আমার ঘুম পেয়েছে। আমি শুয়ে পড়ছি।

সকাল সাড়ে ছটায় পরশ পৌঁছে যায় অধ্যক্ষ হামিদুর রহমানের বাসায়। কলিং টিপতেই কাজের ছেলেটা দরজা খুলে দেয়। পরশের দুহাতে দু ব্যাগ কাজের ছেলে

রাব্বি নিজের হাতে নিতে নিতে বলে—"স্যার তো সকাল আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। "আসুন ভেতরে আসুন।"

"স্যার কোথায়?"

"শোবার ঘরে। আপনি বসুন স্যারকে ডেনে আনছি।"

পরশ বসার ঘরে বসে। ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করে। স্যারকে পরশ বলেছিল দশটার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। কিন্তু চাচীর কাছে রনি, রবির কাছে বিদায় নেবার সময় দেরী হয়ে গেল। এখন যে কী বলবে স্যারকে।

স্যার খবর পেয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতেই পরশ এগিয়ে পা ধরে সালাম করে। "থাক বাবা থাক। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এসো বসি।"

পরশ স্যারের পিছু পিছু সোফায় বসে—বেশ দূরত্ব রেখেই। "স্যার চাচী" চাচাত ভাইদের সঙ্গে আসার সময় ২/১ কথা বলতে দেরী হয়ে গেল স্যার।"

"ও কিছু নয়। আপনজনদের ছেড়ে আসতে এ কথা সে কথা একটু দেরী হবে বৈকি। তা প্রথম দিনের ক্লাস কেমন লাগলো?"

"খুব ভাল লেগেছে। প্রথম দিনের চারটি ক্লাসই খুব ভাল লেগেছে।"

বনফুল ছুটে আসে। পেছন পেছন রাব্বি ট্রেতে চা নাস্তা নিয়ে আসছে।

"কেমন আছো পরশ? তোমার স্যার তো কখন থেকে অপেক্ষায় পায়চারি।"

"কেন? তুমি বুঝি অপেক্ষা করনি? বার বার আমাকে জিজ্ঞেস করেছো। নাস্তা বানিয়ে রেখেছো ওর জন্য।"

বনফুল পরশের পাশে বসে।

"কেমন আছো বাবা? এতো জড়সড়ভাবে বসেছো কেন? তুমি এ বাড়ির ছেলে। এক ছেলে বিদেশে। আরেকজন আমাদের সঙ্গে। কী বলো পরশ?"

পরশ বনফুলের পা ছুঁয়ে সালাম করে।

"থাক বাবা থাক। সালাম কেন?"

"বাহ্ আমি আপনার ছেলে হলাম। এ শুভক্ষণে সালাম করে গর্ব অনুভব করছি।"

"নাও চা নাস্তা খাও।"

"এতো কিছু? দুপুরে খাবো কী করে?"

"দুপুর হতে অনেক দেরী।"

"তোমার স্যার তো তোমার জন্য সকালে ভাল করেই নাস্তা খেতে পারেনি। তোমার হাতে তুলে দাও তোমার স্যারকে।" পরশ কম্পিত হাতে দুজনকে নাস্তা প্লেটে তুলে দেয়।

"তুমিও নাও" বনফুল বলে।

দ্বিধা সঙ্কোচ পরশকে আড়ষ্ট করে তুলছে। পরশ মনে মনে ভাবে বনফুল ওকে ছেলে বলেছেন। বুকের ভেতর ওর ভাংচুর হচ্ছে। 'মা' পরশের ভেতরটা ভাংচুর হচ্ছে : মা, মা তুমি কোথায়? অন্যমনস্ক হয়ে যায় পরশ।

"কী ভাবছো পরশ?" অধ্যক্ষ হামিদুর রহমান স্নেহস্বরে বলেন।

"তেমন কিছু নয়" ভাবছি জীবনের এক বাঁক থেকে অন্য বাঁকে আসা।"

"জীবনের ধর্মই তাই। বাঁকে বাঁকে পথ চলতে চলতে সত্য সুন্দরকে জানা যায়।"

অধ্যক্ষ হামিদুর রহমান চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেন। আরো বলেন "তা গ্রামের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ে। গ্রাম নাকি শহর কোনটা ভাল লাগছে?"

গ্রাম আর শহরের পার্থক্য অনেক। এ নিয়ে আমার ভাবনায় কিছুই নেই। লেখাপড়া করে সামনে এগুনোই আমার একমাত্র স্বপ্ন। সে জন্য যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। ঢাকা শহরে আমার সব চেয়ে বড় পাওয়া আপনার মত একজন দরদী অধ্যক্ষ পাওয়া আর ঢাকা কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়া।"

হামিদুর রহমান পরশের পাশে এসে বসেন। ওর পিঠে হাত রেখে বলেন—"তোমার কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগলো। এ ঢাকা শহর আরো কত সুযোগ ও তো পেতে পারো। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। বুঝলে?"

"এ-ই তোমার মাস্টারী শুরু হলো তো? কখন এসেছে ছেলেটা। রাব্বিকে ডেকে বলো ওকে ঘরে নিয়ে যেতে। গোছগাছ করুক। গোসলটা সারুক। একটু বিশ্রাম নিক। আমি রান্না ঘরে যাচ্ছি। দুপুরে খাবে না?"

"সত্যি বলেছো। ছেলেটা আসতে না আসতে গল্প ছুড়ে দিলাম। রাব্বিকে বলো ওকে ওর রুমে নিয়ে যেতে। পরশ তুমি রুমে যাও। গোছগাছ করে গোসল সেরে বিশ্রাম নাও। দুপুরে খাওয়ার টেবিলে দেখা হবে। বিকেলে লনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করবো। শুক্রবারে দুপুরে খেয়ে আমার একটু ঘুমানোর অভ্যাস আছে।"

বনফুল রাব্বিকে ডেকে বলে পরশকে রুমে নিয়ে যেতে। "বনফুল বলে যাও বাবা একটু বিশ্রাম নাও।" পরশ উঠে দাঁড়ায়।

বেশ বড় রুম, পড়ার টেবিল, টেবিল বাতি, পাশে বুক সেলফ, কিন্তু বই নেই। পরশের জন্যই এ সেলফ, অন্য পাশে আলমিরা, বড় বিছানা। বেশ পরিপাটি। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে সবুজ লন, গাছ ফুলের বাগান, গাছালি। পরশ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে নীল আকাশটার দিকে তাকায়। খুব ভাল লাগে পরশের। নানা ভাবনায় তোলপাড় চলে ভেতরে। এ রকম তোলপাড় ওকে প্রায়ই আনমনা করে তোলে। কিন্তু এ তোলপাড়কে বেশি পাত্তা দেয় না। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মনে মনে ভাবে কী লাভ এ তোলপাড়কে প্রশ্রয় দেয়া। তাতে লাভ কী?

কিন্তু আজ নীল আকাশটা ওকে আনমনা করে তোলে। ওর অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎটা নিয়ে ভাবতে ভাল লাগে। এভাবে নিবিষ্ট ভাবে নিঃসীম আকাশটা এমন ভাবে দেখা হয়নি কোনদিন। মায়ের মত আকাশটা কী মমত্বে যেন পরশকে আগলে রেখেছে। পরশের চোখের পাপড়ি ভিজে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট শব্দে বলে—"খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা—খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন পড়তে পড়তেই পরশের দুচোখ ভিজে যায়। পরশ সরে আসে জানালার ধার থেকে। আবেগকে কখনও প্রশ্রয় দিতে চায় না পরশ। কারণ পরশ বিশ্বাস করে আবে দিয়ে জীবনের কঠিন পথ অতিক্রম করা যায় না। বরং মানসিক ভাবে দুর্বল জবারই সম্ভাবনা।

পরশ ব্যাগ থেকে কাপড় নামিয়ে আলমিরাতে সাজিয়ে রাখে। বুক সেলফে যা বই ছিল সেগুলো রাখলো। টেবিলে খাতা পেন্সিল ক্লাসের কিছু বই যত্ন সহকারে রাখে। গোসলটা সেরে আরামদায়ক ফোমের বিছানায় গাটা এলিয়ে দেয়। নানা ভাবনা জটপাক খায় ওর ভেতরটা। কোথা থেকে কোথায় আসা। এই তো মাত্র যাত্রা

শুরু। আরো অনেকদূর যেতে হবে। কঠিন হবে নাকি মসৃণ হবে কে জানে। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো টেরই পেল না। হঠাৎ রাব্বির ডাক "ভাইয়া খাইতে ডাকে। পরশ হুড়মুড়িয়ে উঠে বসে। খাইবেন না? সাহেব, বেগম সাহেবা আপনাকে খাইতে ডাকছে।" "সর্বনাশ! চল যাই।" পরশ রাব্বির পিছু পিছু খাওয়ার টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়।

"এসো বাবা। নিশ্চয়ই ক্ষিধা পেয়েছে?" পরশ বিনম্রভাবে বলে "তেমন ক্ষিধা লাগেনি। কত নাস্তা খাইয়েছেন বলুন তো?"

"ওকি আর লজ্জায় বলবে?" হামিদুর রহমান হাসতে হাসতে বলেন। "লজ্জা পেলে চলবে কীভাবে? আমার কাছে আবদার করবে। আন্টি এটা খাবো, ওটা খাবো। দেখ একদিনের আমার বাসাটা সরগরম মনে হচ্ছে। তুমি তোমার পছন্দের খাবার চেয়ে খাবে। নাও খাও এবার। আমি তুলে দেব না। দেখি তুমি কোনটা পছন্দ করো।"

পরশ লজ্জায় কাচুমাচু খায়। তবুও বাধ্য হয়ে বনফুলের কথায় নিজেই তুলে নিলো।

"রুমটা পছন্দ হয়েছে?" হামিদুর রহমানের প্রশ্নে পরশ বলে—"জ্বি স্যার খুব সুন্দর রুম। জীবনে এ প্রথম নিরিবিলিতে পড়ার সুযোগ পেলাম। জানালা দিয়ে আকাশ, সবুজ লন, গাছগাছালি সত্যিই দারুন।"

"তুমি তো কবিতা লেখ।" বনফুলের প্রশ্নে স্বয়ং স্যারের সামনে লজ্জাই পায় পরশ।

"এগুলো কবিতা নয় মনের আবোল তাবল ভাবনা—আর একাকীত্বকে দূর করার উপায়। আপনি তো ভাল কবিতা লিখেন। আপনার দেয়া কবিতার বই কতবার যে পড়েছি।" "পরে শুনবো কোন কোন কবিতা তোমার ভাল লেগেছে। এখন মন দিয়ে খাও তো।"

"এরই মধ্যে পরশকে কবিতার বই দেয়া হয়ে গেছে?" স্বামীর টিপ্পনীতে বনফুলও বলে—বলে, "বারে দিতে ক্ষতি কী? আমার কখানা কবিতার বই বেরিয়েছে তুমি নিজেও বোধহয় জান। পড়েছো কটি?"

"দ্যাখ তোমার কবিতার প্রথম পাঠক আমি।"

"তা ঠিক।" বনফুল হাসতে হাসতে বলে।

"কী পরশ খাচ্ছ না কেন?"

বনফুলের কথায় পরশ হেসে বলে "আন্টি অনেক খেয়েছি। দারুণ হয়েছে মুড়িঘণ্ট রুই মাছ, আমি উঠি আন্টি?"

"হ্যাঁ যাও।"

হামিদুর রহমান ও উঠে দাঁড়ায়, আমিও আমি। শুক্রবারে বিছানায় গড়াগড়ি না দিলে ভাল লাগে না। পরশ বিকেল চারটায় লনে চায়ের টেবিলে দেখা হবে।"

"জ্বি স্যার।"

সে যার মত উঠে যায়। হামিদুর রহমান বিছনায় শুয়ে একটা সিগারেট ধরায়। বনফুলও হাতের কাজ সেরে ঘরে ঢোকে। চেয়ারের উপর রাখা শাড়ি ভাঁজ করতে করতে বনফুল বলে—"এতোদিন বাড়িটা শূন্যতায় খাঁ খাঁ করত। পরশ আসতেই বাড়িটা অন্য রকম লাগছে। কেমন পাল্টে গেছে বাসার পরিবেশ আচ্ছা শোন।"

"কী?"

পরশের বাবা তোমাকে পরশ সম্পর্কে সব বলে গেছে। এসব পরশকে বলছো?"

"এখনই কিছু বলবো না। আগে শুনি সে কী বলে। বড্ড চাপা ছেলেটি।"

"হ্যাঁ যাই ভাল।"

ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে হামিদুর রহমান। পাশে বনফুল ও। কিন্তু পরশের ঘুম আসে না। কোথা থেকে কোথায় আসা। সেই ছোটবেলার অস্পষ্ট স্মৃতিগুলো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠে চোখের সামনে। কাউকেই কিছু বুঝতে না দিয়ে বুকে পাথর চাপা কষ্ট নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছে শুধু নিজের স্বার্থে। স্মৃতি তো সামনে এগুতে দেয় না বরং স্মৃতিই সামনে চলার সাহস দেয়। নিজকে কষ্ট থেকে দূরে রেখে সামনে এগুবার পথ খুঁজে বেড়িয়েছিল প্রিয় মুখগুলো কী কোনদিন দেখা হবে না? পরশ ঘর্মাক্ত হয় আর এপাশ ওপাশ করে। ঘুম আসছে না মোটেও। বিকেলে চায়ের পর্ব সেরে স্যারকে বলে চাচার বাসায় ঘুরে আসবে। স্যার অনুমতি দেবেন তো? এখানে থাকতে হলে স্যারের কথা মত চলতেই হবে।

নানান কথা ভাবতে ভাবতে পরশ জানালার পাশে দাঁড়ায়। বিকেলের সোনালী রোদে চারদিকে কী সুন্দর লাগছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সোনালী আভা চিকচিক করছে।

হঠাৎ রাব্বির ডাক। "ভাইয়া লনে চা দেখা হয়েছে। সাহেব বেগম ডাকছে আপনাকে বলতে বলতে রাব্বি ঘরেই ঢুকে যায়।

"কী ভাইয়া জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কী ভাবছেন? চলুন স্যার বেগম সাহেব ডাকছেন। আপনি আসার পর এ বাড়ির পরিবেশটা আনন্দে ভরে উঠেছে। একা একা এ বাড়িতে দম বন্ধ হয়ে আসতো। স্যার তো সন্ধ্যা পর্যন্ত কলেজেই কাটান। বেগম সাহেব একা একা থাকেন। আমার বেগম সাহেব খুব ভাল। সারাদিন সংসারের টুকিটাকি কাজ সেরে বিকেলে লিখতে বসেন। আপনি আসতে স্যার বেগম সাহেব মহাখুশি। যেন তাদের ছেলেকে ফিরে পেয়েছেন। আমিও খুশি জানেন তো?"

"তাই নাকি? বলেই রাব্বিকে জড়িয়ে ধরে বলে "চলো লনের দিকে যাই।"

দরজা পর্যন্ত এসে রাব্বি বলে—"আপনি লনে যান। আমি স্যার ও বেগম সাহেবকে বলি—আর নাস্তার ট্রেটা নিয়ে আসি।"

পরশ ঘর থেকে বেরিয়ে লনে আসে। সবুজ চকচকে ঘাসের উপর চেয়ার টেবিল। পরশ চারপাশ হেঁটে দেখে। কী অপূর্ব। দেয়াল ঘেষে কত গাছগাছালি। ঘাসের সজীবতা, গাছের পত্র পল্লবের সজীবতায় কী আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। পরশের ইচ্ছে হয় পায়ের স্যান্ডেলটা খুলে খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়।

পরশ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে—

"সূর্য পানে চেয়ে ভাবে
মল্লিকা মুকুল,
কখন ফুটিবে মোর
অত বড় ফুল।"

সৌন্দর্যমুগ্ধ পরশ হৃদয়ের সমস্ত আবেগে সারিসারি গোলাপ গাছের পাশে দাঁড়িয়ে গোলাপের নির্যাস নিতে নিতে চেনা মুখ খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ বনফুলের ডাকে সম্বিত ফিরে পেছন দিকে তাকায়।

"জ্বি আন্টি।"

"হরেক রকমের ফুলে বাগানটা সত্যিই সুন্দর।"

"তাই তো দেখছি। আশ্চর্য্য সুন্দর!!"

হামিদুর রহমানও এগিয়ে আসে।

"এসব তোমার আন্টির পরিকল্পনা। আমার এসব দেখার সময় কই।"

"আন্টি সত্যিই অদ্ভুত সাজানো বাগান।" কী করবো তোমার স্যার তো শুধু কলেজ আর কলেজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমার সময় কাটে ফুল বাগান গাছগাছালির যত্ন রান্না সেরে কবিতা লেখায়। চলো রাব্বি নাস্তা নিয়ে এসেছো।"

"হ্যাঁ চলুন।"

"তা ঘুমিয়েছো তো একটু?" হামিদুর রহমানের প্রশ্নের বিনম্র ভাষায় বলে—"নাহ্ স্যার ঘুম আসেনি। এপাশ ওপাশ করে উঠে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সবুজ ঘাস গাছগাছালি আর ফুলের বাগান দেখতে খুব ভাল লাগলো তারপর টেবিলটা গুছিয়ে ক্লাস রুটিনটা আবার ভাল করে দেখলাম। এভাবেই সময়টা কেটে গেল স্যার।"

বনফুল প্লেটে নাস্তা দিয়ে পরশের হাতে তুলে দেয়। পট থেকে চা ঢেলে পরশের সামনে রাখে।

"খাও বাবা।"

বনফুলের মুখে বাবা শব্দটি শুনতেই পরশ আনমনা হয়ে যায়। কি যেন ভাবে।

বনফুল ও হামিদুর রহমান তা খেয়াল করে।

"কী হলো হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলে কেন? গ্রামের কথা গ্রামের বাবার কথা মনে পড়লো বুঝি?"

বনফুলের এ যেন অপ্রস্তুত প্রশ্নে পরশ নিজকে সামলে নিয়ে বলে—"নাহ্, নাহ্, তা নয় বাবা ডাকটা বড্ড প্রিয় ডাক। এ ডাক আমাকে দুর্বল করে দেয়।"

প্রসঙ্গ পাল্টে হামিদুর রহমান অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।

"তোমার স্কুলটা গ্রামে হলে ও খুব ভাল স্কুল। দেখ না শহরের নাম করা স্কুল থেকে পাস করে ও ঢাকা কলেজে ভর্তির অনেকে সুযোগ পায়নি। তুমি অনায়াসে ভর্তি হয়ে গেলে।"

"জ্বি স্যার স্কুলটা খুব ভাল। শিক্ষকরা ও আন্তরিক।"

"সে স্কুলে লাইব্রেরিতে ভাল Colleclion আছে?" গ্রামের স্কুল তো। পাঠ্য পুস্তকই ছিল বেশি। আর ছিল রবীন্দ্র ঠাকুরের ছোট গল্প, গীতবিতান, সঞ্চয়িতা, কাজী নজরুল ইসলামের সঞ্চিতা, মুক্তিযুদ্ধের উপর যৎসামান্য বই, বঙ্গবন্ধুর উপর কিছু বই, আর শওকত ওসমান, শামসুর রহমান, কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা সমগ্র সহ জীবনানন্দ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু বই। আছে আরো হুমায়ুন আহ্‌মেদও ইমদাদুল হকের উপন্যাস।"

"লাইব্রেরিতে পড়ালেখা করতে তো?"

"লাইব্রেরিতে সময়ের অভাবে বেশি বসা হতো না।"

"কেন?"

"ক্লাসের পরে স্যারদের সাহায্য নিতেই ব্যস্ত ছিলাম। আমার বাবার তো সামর্থ ছিল না প্রাইভেট টিউটর রাখা। তাছাড়া স্যাররা আমার আগ্রহ দেখেই ক্লাসের পরে আমাকে সাহায্য করতেন। লাইব্রেরি থেকে বই ইস্যু করে বাড়িতে বসে অবসরে পড়তাম। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা পড়ে এমনই ভক্ত হয়ে উঠলাম যে তার ছোট গল্প, উপন্যাস বেশ কটা পড়েছি। শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি আমাকে ভীষণ টানে। মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধুর উপর যে কটা বই পড়েছি বুকের কষ্টটা বাড়তো অনেক। বঙ্গবন্ধুর এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড আমি মেনে নিতে পারছি না। তাঁর জন্ম না হলে বাংলা দেশই তো স্বাধীন হতো না। তিনি বেঁচে থাকলে ত্রিশ লাখ শহীদের তালিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণীত হতো। শহীদের সন্তানরা কে কোথায় আছে, কী মানবেতর জীবন যাপন করে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এ সবই হতো। আপনার বসার ঘরটা তো রীতিমত লাইব্রেরি। আমার ভাল কাটবে এখানে।"

"তুমি তো কবিতা লিখো। তাই না?" বনফুলের প্রশ্নে পরশের মুখ খানা লাল হয়ে যায়। বলে "এসব কবিতা টবিতা কিছু নয় কষ্ট থেকে অক্ষরের আঁচড়। এটি আমার একান্তই নিজেই নিজের ভাবনার প্রকাশ।"

হামিদুর রহমার যে কী ভাবে কথাটা বলবেন ভেবে পাচ্ছে না। বনফুলের দিকে ইশারায় তাকায় "বলবো কিছু?"

বনফুল ইশারায় বলে "বলো"।

হামিদুর রহমান কোন ভনিতা না করে সরাসরি বলে—"দ্যাখ পরশ তোমার ভেতরে একদিকে কষ্টের নদী, অন্য পাশে অবিরাম রক্তক্ষরণ নিয়ে জীবনের এতোটা পথ এসেছো। তোমার খুব ছোটবেলার স্মৃতির কথা মনে পড়ে?"

পরশের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। স্যারের কথায় ওর শরীরটা ঘামছে। বনফুল ও হামিদুর রহমান তা লক্ষ্য করে।

"কী পরশ কিছু বলবে?"

"পরশ কম্পিত কণ্ঠে বলে-নদী, রক্তক্ষরণ ছোটবেলার স্মৃতি এ সব কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। আমার ছোটবেলার স্মৃতি খুবই ঝাপসা। আর তা জেনে লাভ কী স্যার? থাক না ওসব কথা। নদী, রক্তক্ষরণ সব মানুষই বুকে বয়ে বেড়ায়। গরিব বাবার অসীম স্নেহে নানা প্রতিকূলতাকে দুপায়ে ঠেলে এ পর্যন্ত এসেছি। আপনার কাছে এলাম। এ আসাই আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য। এটিই আমার পরম পাওয়া।

"দ্যাখ পরশ তোমার বাবা জব্বার মিয়া আমাকে সব খুলে বলে গেছেন। এ-ও বললেন "স্বাধীনতার পর এ প্রথম আপনাকেই সব খুলে বললাম—এ কারণে যে পরশ আপনার অভিভাবকত্বেই থাকবে। পরশ মহান মুক্তিযুদ্ধের সন্তান হিসেবে দেশের মানুষ জানা উচিৎ। এতো বড় গর্বকে লুকিয়ে না রেখে পরশ এ গর্বের গর্বিত হওয়া উচিৎ। তিনি আরো বললেন পরশের প্রকৃত মা বাবা আছেন কী নেই জানি না। তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে রাষ্ট্রের জানা উচিত।"

"বাবা এসব কথা বলে গেছেন? কেন বললেন এসব কথা? আমি বুঝতে পারছি না।"

তোমার বাবার কাছে থেকে এ কথাগুলো শুনেই আমি তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। তুমি কত বড় গৌরব গাঁথা বয়ে বেড়াচ্ছো তুমি নিজেও জান না। আমি মনে করি পরশ তোমার এ গৌরব গাঁথা সবার জানা উচিৎ।"

পরশ নিজকে আর সামলাতে পারে না। মুখে হাত দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠে। বনফুল পরশকে জড়িয়ে বলে "কেঁদো না। এ তোমার গৌরব।"

কাঁদতে কাঁদতে পরশ বলে—"স্যার এ মুহূর্তে নিজকে এতিম বলে মনে হচ্ছে। মা বাবা ভাই বোন কেউ নেই আমার। চারদিক শূন্য মনে হচ্ছে। কী শোনালেন স্যার আমাকে।"

"শূন্যতা থেকেই পূর্ণতা আসে। এতো কষ্টের পর পূর্ণতাই তোমার জীবনকে কানায় কানায় ভরিয়ে দেবে দেখবে একদিন। জীবনের ধনকিছুই যায় না ফেলা।"

"জানি না স্যার।"

"তুমি মন খারাপ করো না। তোমার বাবা বুদ্ধিমানের কাজটিই করেছেন। মহান সত্য গোপন করার কোন কৃতিত্বও নেই। আমাকে কথাগুলো বলে ভাল কাজটিই করেছে না। তা তুমি পরে বুঝতে পারবে। তোমার বাবা যা বলেছেন আবেগে বশবর্তী হয়ে নয়; তাঁর যে অভিজ্ঞতা—সে অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে বুঝেছেন এ বিষয়টি আমার জানা দরকার। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন জান?" "কী স্যার?"

হায়, উঠিতে চাহিছে পরাণ, তবুও
পারে না তাহারা উঠিতে।
তারা পারে না ললিত লতার বাঁধন টুটিতে।
তারা পথ জানিয়াছে, দিবানিশি তবু
পথ পাশে লুটিতে।

"ভেতরে যন্ত্রণা, রক্তক্ষরণ, কষ্টের নদী বইতে থাকে তবুও কিছু কাউকেই কিছু বলতে পারে না। হঠাৎই এমন হয়—যাকে দেখে মনে হয় তাঁকে কিছু বলা যায়। তোমার বাবার ও সে অবস্থা হয়েছে। এমনও তো হতে পারে এ বলার জন্যই কোন সত্য তুমিই আবিষ্কার করে ফেলবে।"

"সত্যি বলেছেন স্যার। এমন কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে দেখা হলে নিজের অজান্তেই নিশ্চিন্তে সুখ দুঃখের কথা নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে।" আপনাকে দেখে বাবারও তাই হয়েছে।"

"তোমার বাবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ সত্য থেকে আরো কত সত্য বেরিয়ে আসতে পারে। কে জানে। তুমি সিরিয়াসলি লেখাপড়ায় মন দাও। এটিই তোমার কাজ।"

"জ্বি স্যার।"

"অনেক সিরিয়াস কথা বলা হয়ে গেল। এবার পরশের কবিতা শুনবো।" বনফুল হাসতে হাসতে বলে।

"আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন আন্টি। আমি তো কবিতা লিখি না—মনের আবোল তাবোল ভাবনা শুধু। ছন্দ, লয় কিছু বুঝি না। রাতের বেলা ঘুম না আসলে সময় কাটানোর একমাত্র উপায় মাত্র।"

"তবুও শোনাও।"
"পরে আপনি শোনাবেন তো?"
"হ্যাঁ শোনাবো।"
পরশ আবৃত্তি করে শোনায়
আরো অনেক দূর যেতে হবে
মাঝখানে ভাঙ্গা সেতু
সামনে পাথর পাহাড়—
আলো আঁধারী রাস্তা মিলিয়ে যাচ্ছে
যাক ...
চড়াই উৎরাই পায়ের তলায়
রক্ত ঝরায়
ও কিছু নয়;
ক্ষীণ আলোর পথ ধরে
পাহাড় সেতু ভেঙ্গে সেইখানেই যাবো
যেখানে মিলেছে আকাশ
রক্তিম পলাশ ডাঙ্গায়
কারণ
আরো দূর যেতে হবে আমাকে।।

"বাহ্ চমৎকার" বনফুলও হামিদুর রহমার সমস্বরে বলে উঠেন।

"তোমার চৈতন্যের দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠেছে এ কবিতায়। বনফুল এভাবে ব্যাখ্যা করে।

"পরশ বলে যা মনে এসেছে তাই লিখেছি। এবার আপনার একটা ...।

"তোমার আন্টি তো ছোট কবিতা লেখেন না।"

"বড় কবিদের তো তাই ধর্ম। শব্দের বিশাল মালা মনের ভেতর ভিড় জমানো থাকে বড় কবিতা না হয়ে উপায় কী।" পরশ বলে।

বনফুল ভেবে চিন্তে ছোট কবিতা আবৃত্তি করো। অন্য দিন পরশকে পাশে বসিয়ে ঘন্টার পর কবিতা শুনিও।"

হামিদুর রহমানের কথায় পরশ শব্দ করে হেসে বলে—"হ্যাঁ আন্টির সাথে খোলা আকাশের নীচে সবুজ চত্বরে কবিতা জমবে ভাল। আজকে একটু শুরু হউক।"

বনফুল ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলে কোন ছোট কবিতাটি আবৃত্তি করা যায়।

বেলা অবেলায়
জড়িয়ে আছো প্রকৃতির মতো
অথচ কিছুই দিতে পারিনি তোমাকে—
স্রোত সমেত নদী
মেঘ সমেত আকাশ
শিউলি সুগন্ধি ভরা ছিল না শরীর
বুকের ভেতর রক্ত জবা ছিল না আমার
তুমি দিয়েছিলে জলপ্রপাত পাথর সময়
দিয়েছিলে ফুসফুস সমেত ভালবাসা

শ্যামলে সুনীলে লাবণ্য দিয়েছিলে;
মুঠো ভরে মেঘ দিয়েছিলে
বৈশাখে আমের মুকুল
বসন্তে বাসন্তি ফুলের পরাগ দিয়েছিলে
আমি কিছু দিতে পারিনি তোমাকে
আমাকে একটু সময় দাও ...
আরেক জনমে সব শোধ করে দেবো।

"আশ্চর্য্য সুন্দর!!" পরশ আবেগে বলে।

"তোমরা দুজনে এ লনে বসে কবিতা পাঠের আসর বসিও।"

হামিদুর রহমানের কথায় বনফুল বলে—"টিপ্পনী হচ্ছে?"

"না টিপ্পনী বলছো কেন? সত্যি বলছি। সেদিন সৌরভকেও আসতে বলবো। তুমি চাইলে রাশিদুল হাসানও তার গিন্নীকেও বলতে পারি।"

বনফুল হেসে সম্মতি জানায়।

"আচ্ছা পরশ একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি।"

"কী স্যার?"

"আমার এক বন্ধু আছে। একটি ব্যাঙ্কের এম.ডি। ওকে তোমার কথা বলেছি।"

"কী বলেছেন স্যার?" চমকে উঠে পরশ।

নাহ্ তেমন কিছু নয়। বলেছি গ্রামের একটি ছেলে খুব ভাল করে আমার কলেজে ভর্তি হয়েছে। মেধাবী ছাত্র। ওকে হোস্টেলে থাকতে না দিয়ে আমার বাসায় নিয়ে এসেছি। হোস্টেলে থাকলে কখন কোন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে বলা যায় না। গ্রামে থাকা মেধাবী সহজ সরল ছেলেটিকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। খুব পড়ুয়া ছেলে। আমিও একা থাকি। তাই ওকে নিয়ে এলাম নিজের কাছে। আমার বন্ধু আজ তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে। বনফুল আগেই বিষয়টা জানে। তাই কিছু বললো না।

"আজই স্যার? এখন তো ছটা বাজে।"

"সাড়ে সাতটা কী আটটায় যাবো। রাতে ওখানেই খেতে বলেছে। ভদ্রলোক তুখোড় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধের সময় বুলেটের আঘাতে একটা পা একটু খোঁড়া হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর অসম্ভব ভক্ত। যাবে?"

"স্যার আপনি বললে তো নাহ্ করতে পারি না।"

"তবে চলো ঘরে যাই। একটু বিশ্রাম নিয়ে সাড়ে সাতটা কি পৌনে আটটায় রওনা দেবো।"

তিনজনই উঠে দাঁড়ায়।

কলিংবেল টিপতেই মধ্যে বয়সী কাজের লোক দরজা খুলে লম্বা সালাম ঠুকে বসার ঘরে বসাতেই রাশিদুল হাসান ছুটে আসে। কোন দিকে না তাকিয়ে হামিদুর

রহমানকে বুকে জড়িয়ে ধরে। পরশ রাশিদুল হাসানের চেহারাটা ভাল করে খেয়াল না করে বিশাল ড্রইং রুমে সাজানো জৌলুস চোখ ভরে দেখে। চোখ পড়ে দেয়ালে টাঙ্গানো ছোট একটা ছেলের ছবি। চমকে উঠে পরশ। আরো চমকে উঠে দেখে অন্য দেয়ালে মাঝে ছোট ছেলে দুপাশে মা বাবার বিশাল ছবি। পরশ চমকে উঠে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছবিগুলোর দিকে। বড্ড চেনা এ ছবিগুলো।

হামিদুর রহমান রাশিদুলের হাত ধরে পরশের সামনে দাঁড়ায়। পরশ উঠে দাঁড়ায়। এক দৃষ্টিতে রাশিদুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একি স্বপ্ন নাকি বাস্তব। রাশিদুল নিজের অজান্তেই পরশকে বুকে জড়িয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে। পরশ ও নিজেকে সামলাতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে রাশিদুলের পায়ের উপর পড়ে যায়। বনফুল ছুটে ভেতরে যায় রাশিদুলের স্ত্রী মমিকে ডেকে আনবার জন্য। রাশিদুল স্ত্রীকে আগে কিছুই জানায় নাই। হামিদুর রহমানের কাছে ফোনে বিস্তারিত শুনে তাদের আসতে বলেছে বিষয়টি কতখানি সত্য!

বনফুল রাশিদুলের স্ত্রী মমিকে খবরটা দিতেই পাগলের মত ছুটে আসে বসার ঘরে। থমকে দাঁড়ায়। পরশ ও রাশিদুল বুকে বুকে মাথা রেখে হাউমাউ করে কাঁদছে।

"বাবা পরশ তুই ফিরে এলি? কোথায় ছিলি এতোদিন। সেই ছোট খোকা পরশ ফিরে এসেছে মমি। ছোট পরশ কত বড় হয়ে গেছে!!"

মমি ছুটে যায়। পরশকে জড়িয়ে হাউ মাউ করে কান্না। "আমি স্বপ্ন দেখছিনাতো? কোথায় ছিলি এতোদিন মা বাবাকে ছেড়ে?"

"আমি কোথায় ছিলাম তোমরা কী খোঁজ নিয়েছিলে? খবর নিয়েছিলে কী পরশ বেঁচে আছে কিনা? ছেলেকে ভুলে তোমরা বেঁচে আছো তো ভালই। তোমরা হয়ত ভেবেছো পরশ সেদিন জোয়ারের ঢেউ এর তোড়ে পানিতেই ডুবে মরেছে। তাই হয়ত খবর নেয়ার প্রয়োজন মনে করনি।"

রাশিদুল হাসান পরশকে জড়িয়ে বলে "তুই ভুল বলছিস। '৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের অবস্থাটা ছিল অন্য রকম। সীমান্তে পাড়ি দেয়াটা ছিল খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। ঢাকা থেকে কখন কোন সময় কীভাবে যে মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়। যখন শুনতাম বা জানতাম অমুক মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে যেতো। মুক্তিযুদ্ধ আমাকেও ভীষণ টানতো। কিন্তু কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না কীভাবে সীমান্ত পাড়ি দিতে হবে। দিবা নিশি এ যন্ত্রণায় ভুগতাম। হঠাৎ একদিন আমার এক পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা। বিশ্বস্ত বন্ধু বলেই আমার মনের ইচ্ছাটির কথা ওকে বলতেই সে লাফিয়ে বললে—"দোস্ত সীমান্তে আমি বহু পরিবার পার করেছি। এটি আমার মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব। তবে শর্ত আছে।

"কী শর্ত?"

নিজের নাম ধাম বলতে পারবে না। গ্রামে যে বাড়িতে ২/১ দিনের জন্য থাকবে লুকিয়ে থাকতে হবে। গ্রামের নাম বা গৃহকর্তার নাম ও জানতে চাইবে না গৃহকর্তা সময় মত নিরাপদে সীমান্ত পারের ব্যবস্থা করে দেবে। সাধারণ কাপড়ে যাবে। সঙ্গে প্রয়োজনীয় পোটলা করে নিতে পার। "কোন বিপদে পড়বে না তো?"

আরে নাহ্। ভয় নেই এটিই আমার কাজ। আমি পরশুদিন সকালে এসে বলে যাবো কখন রওনা দিতে হবে। তুমি তৈরি থেকো।

একটু থেমে বলে রাশিদুল—"আমারও সে বন্ধুর সঙ্গে রওনা দিলাম সন্ধ্যা নাগাদ। সাধারণ পুরানো লুঙ্গি, পুরানো শার্ট আর মমি পুরানো শাড়ি পরেছে পরশকে ও পুরানো ময়লা শার্ট হাফপ্যান্ট পরিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসের একটা পোটলা নিয়ে আল্লাহর নামে রওনা হলাম। আমার বন্ধু আমাদের নিয়ে একটি নিঝুম গাঁয়ে পৌঁছেছি বেশ রাতে। গৃহকর্তা খুব সাবধানে ওর এক চিলতে টিনের ঘরের দুটি রুমের মধ্যে একটি রুমে আমাদের থাকার জায়গা করে দিয়ে ফিসফস করে বললো "শব্দ করে কোন কথা বলবেন না। আমি আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। আমার বন্ধু আসার সময় কিছু ডিম ও চাউল ক কেজি সঙ্গে নিয়েছিল ভাগ্যিস। ঐ ডিম রান্না করে গৃহকর্তা আন্তরিকভাবে আমাদের আপ্যায়ন করলো। পরশ খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। রাতেই গৃহকর্তার সঙ্গে আমার বন্ধুকে নিয়ে বসলাম। গৃহকর্তা বললো এখানে কেউ আসলে একদিনের বেশি রাখা নিরাপদ নয়। শান্তি কামটি আর আলবদর রাজাকারদের দৌরাত্ম বাড়ছে দিন দিন। সুতরাং ঠিক হলো পরের দিন শেষ রাতেই যাত্রা করতে হবে। আমি বললাম কীভাবে?"

গৃহকর্তা হাসতে হাসতে বলল "২৫শে মার্চ থেকে সীমান্তে পার করে দেখাই আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে। আমি মাঝি। আমার ছোট নৌকায় করে এ মহৎ কাজটি করে আসছি নিরাপদে। আমার উপর ভরসা রাখুন। এখন ঘুমিয়ে পড়েন। দিনের বেলা ঘর থেকে বের হবেন না। দিনের বেলাটা কোন ক্রমে কেটে যাক।" গৃহকর্তা ফিস ফিস করে কথা গুলো দ্রুত বেরিয়ে গেল। ছোট রুমে ছোট খাটো মসি পরশকে নিয়ে ঘুমালো। আমি আর আমার বন্ধু নিচে মাদুরের উপর কাঁথা বিছিয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লাম। বড্ড ক্লান্ত ছিলাম। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। দেরী করে ঘুম ভাঙ্গলো। আমার বন্ধু দরজাটা খুলে ফিসফিস করে ডাকে কর্তা মশাই।

এক ডাকেই গৃহকর্তা ছুটে এল।

"জানি আপনাদের খুব কষ্ট হয়েছে। কী করবেন স্যার মুক্তিযোদ্ধারা তার ও বেশি কষ্ট করে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করছে। ওদের অমানুষিক কষ্ট সহ্য করা যায় না স্যার। স্যার কিছু মনে করবেন না ঘরের পেছনে আপনাদের জন্য পানি তোলা আছে। বাথরুমটা মাটির তৈরি। আপনাদের কষ্ট হবে।"

"নাহ্, নাহ্ কী বলছেন। দেশ স্বাধীন করতে হলে এভাবেই কষ্ট সইতে হয়। চলুন স্যার তাড়াতাড়ি আপনারা সেরে নিন। আমার স্ত্রী আপনাদের জন্য চিতই পিঠা বানিয়েছে। যান স্যার।"

কোনক্রমে পেছনের দরজা দিয়ে ঘরের পেছনে যাই ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা চারজন তড়িঘড়ি করে কাজ সেরে চিলেকোঠায় ফিরে এলাম। গৃহকর্তা চিতই পিঠা গুড় আর নারকেল নিয়ে ঘরে ঢোকে।

খেয়ে নিন স্যার। এই ছোট ছেলেটা যেন ঘর থেকে বের না হয়। আমার ও একটা ছোট ছেলে আছে। ওকে স্কুলে পাঠিযে দিয়েছি। কোন ক্রমে দিনটা কেটে যাক। আমার বন্ধু নাস্তা খেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। গৃহকর্তা আমার বন্ধুকে বাসে উঠিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে বের হয়। যাবার আগে বন্ধুর সঙ্গে কোলাকুলি করে চোখের জল মুছে নিলাম। এই আমার শেষ দেখা। যুদ্ধের পর শুনেছি পাকবাহিনী

ওর বাড়ি ঘেরাও করে আমার বন্ধুকে ধরে নিয়ে যায়। আর কোন খবর পাওয়া যায়নি আর।

সারাদিন গৃহকর্তার এক চিলতে ঘরে দুশ্চিন্তায় কেটেছে। পারবো কী সীমান্তে পৌঁছতে। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার জন্য হাতটা নিশপিশ করছিল। মুশকিলে পড়লাম পরশকে নিয়ে। ঘর থেকে বের হয়ে গ্রামটা ঘুরে দেখার বায়নায় কান্নাকাটি। ওকে সামাল দিতে মমির হিমসিম অবস্থা। ওর কান্নাকাটি বাইরের লোকের কানে যায় পাছে সে ভয়। ওকে অর্ধেকটা ঘুমের ঔষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলাম। নিজেরাও এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। সে ঘুম ভাঙ্গলো একেবারে বিকেলে। ক্ষিধেও পেয়েছিল প্রচণ্ড। দরজাটা ফাঁক করে ফিসফিস করে ডাকতে লাগলাম "কেউ আছেন?"

আমার ডাকেই গৃহকর্তা ছুটে আসে। "আপনারা ঘুমাচ্ছিলেন বলে ডাকিনি। খাবেন না? আমার গিন্নি খোয়াড়ের মুরগি জবাই করে রান্না করে অপেক্ষা করছে।"

"জ্বি খাবো। আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।"

স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য এ কী-ই বা কষ্ট। দাঁড়ান আমি খাওয়া নিয়ে আসি।"

গৃহকর্তা খাবার নিয়ে আসে। চুপচাপ খেয়ে নিলাম আমরা পরশ তখনও ঘুমাচ্ছে। পরশের জন্য একটা প্লেটে কিছু খাবার একটা প্লেটে তুলে রাখলাম। গৃহকর্তা বললো—"আপনারা বিশ্রাম নিন। শেষ রাতের দিকে বের হবো। সীমান্তে পৌঁছে নানান ঝক্কি নিয়ে আগরতলা পৌঁছতে হবে। দরজাটা ভিড়িয়ে দিন। আমি আসি।"

আমাদের তো সময় কাটতে চায় না। মমির তো ভীষণ ভয়। কখনও নৌকায় ওঠেনি। পরশ ও নৌকায় ওঠে যদি কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। সীমান্তে পৌঁছে কী অবস্থায় পড়তে হয় কে জানে। রাশিদুল পরশকে বুকে চেপে ধরে বলে তোর মনে পড়ে শেষ রাতে নৌকায় চড়ে অন্ধকারে রওনা হলাম। মাসটা ছিল আগস্ট। তুই নৌকায় উঠে ভয় পেয়েছিলি। তোর মা তোকে নৌকার চালের ভেতর বুকে জড়িয়ে রেখেছে। বায়না ধরলি বাইরে গুলুইয়ের কাছে আসতে। তুই বার বার জিজ্ঞেস করছিলি "বাবা আমরা কোথায় যাচ্ছি?" তোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছি গ্রামে আমার এক দাদীকে দেখতে যাচ্ছি। নৌকায় অস্থির সময় কাটাচ্ছিল। সময় যেন ফুরাতে চায় না। হঠাৎ প্রচণ্ড দমকা হাওয়া আর বৃষ্টি। আমি ভয় পেয়ে মাঝিকে প্রশ্ন করলাম পারবে তো এ দমকা হাওয়ায় পার হতে?

মাঝি হাসতে হাসতে বললো "চিন্তা করবেন না স্যার। এমন দমকা হাওয়ায় নৌকা চালাবার অভ্যেস আছে। শুধু প্রচণ্ড ঝড় না আসলেই হলো। বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি একটু দমকা হাওয়া বইতেই পারে। এতে আমার অভ্যাস আছে। ভয় নেই স্যার।"

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া। আমি পরশকে বুকে চেপে ধরে আরেক হাতে মমিকে ধরলাম। চোখের নিমেষে কী হয়ে গেল। নৌকাটা কাৎ হয়ে পড়ে গেল। আমরা সবাই পড়ে গেলাম পানিতে। পানিতে প্রচণ্ড ঢেউ। পরশের হাতখানা আমার হাত থেকে ছিটকে গেল। মমি আমাকে জড়িয়ে ঢেউয়ের তোড়ে পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছিল। চারদিকে অন্ধকার। কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। একবার শুধু মাঝির ডাক শুনতে পেলাম। স্যার আপনারা কোন দিকে।"

আর মাঝির কণ্ঠ শুনতে পাইনি। পরশকে খোঁজার জন্য এদিক সেদিক হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। মমি সাঁতার জানে না। শুধু হাবুডুবু খাচ্ছি। মমিকে পিঠের উপর ধরে ভাসতে লাগলাম সামনের দিকে। হাবুডুবু খেয়ে পাড়ে এসে পৌছালাম। ইতিমধ্যে ভোর হয়ে গেছে। পাড়ে উঠেই মমির হাউমাউ কান্না। "আমার পরশ বাবাকে এনে দাও। পরশ না ফেরা পর্যন্ত আমি কোথায়ও যাবো না।"

চোখ তুলে তাকালাম নদীর দিকে। কোন নৌকাই চোখে পড়ছে না।

"চলো আমরা ফিরে যাই।" মমির কথায় বললাম "কোথায়?"

"মাঝির বাড়ি।"

আমি ওকে জড়িয়ে বললাম "তা কী করে সম্ভব। মাঝির নাম জানি না। জানি না গ্রামের নাম।"

পরশের জন্য আমার ও বুকখানা চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। নিজকে সামলে মমিকে সামলানোই সে মুহূর্তে আমার বড় কাজ ছিল।

"ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। চলো সামনে এগুই। এরই নাম যুদ্ধ। একটু শান্ত হও। মমির কান্না থামে না। মমির কান্নার শব্দ শুনে পাশের ঝোপ থেকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে এল। ওদের দেখে মনে ভরসা পেলাম। ওদের সব খুলে বললাম। ওরা বললো নিরাপদ স্থানেই পৌঁছেছেন। চলুন আমাদের আশ্রয়ে। ওরা মমিকে আন্তরিক ভাবে সান্ত্বনা দেয়। মমির কান্না থামে না।

"তুমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য এসে আমাদের পরম ধনকে হারালাম। তুমি যুদ্ধে না আসলে কী দেশ স্বাধীন হবে না? আমার বুকের মানিক ফিরিয়ে দাও।"

মুক্তিযোদ্ধারা মমিকে বুঝিয়ে বলে "বড় কিছু পেতে হলে বড় কিছু হারাতে হয়। আমাদের অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের চৌকষ আক্রমণে পাক সেনারা কুপোকাৎ হয়ে পিছু হটছে ঠিক। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা ও প্রাণ দিচ্ছে। আমরা এ দলে দশজন ছিলাম। এখন সাতজন। চোখে সামনে তিনজনকে হারালাম। মনোবল হারাইনি। এ দেশ থেকে পাক সেনাদের উৎখাত করে দেশ স্বাধীন করবই। দেখেছেন তো গ্রামের কৃষক শ্রমিক মাঝি সবাই এ যুদ্ধের যোদ্ধা। যে মাঝি কোন কিছুর বিনিময় না নিয়ে আপনাদের সীমান্তে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। অকস্মাৎ ঝড় এসে গেল। মাঝিটার কথা একবার ভাবুন। এ যুদ্ধে কত সন্তান মা বাবা হারিয়েছে। কত বোন স্বামী হারা হয়েছে। কত মা সন্তান হারিয়েছে। আরো হারাতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা ঠেকাতে পারবে না। আপনারা একটু বিশ্রাম নিন। আমাদের সঙ্গে কেউ আপনাদের আগরতলায় পৌঁছে দেবে। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে এসেছেন। আপনি নিশ্চয়ই যে সুযোগ পেয়ে যাবেন। আন্টি শোককে শক্তিতে পরিণত করুন। মমির পরনের শাড়ি শরীরেই শুকিয়ে গেল। আমার শার্টটা খুলে রোদে দিলাম। এক মুক্তিযোদ্ধার প্যান্ট কোনক্রমে পরে আমার পেন্টটা ও রোদে দিলাম। ওদের চিড়ামুড়ি খেয়ে সময়ের অপেক্ষা করছি। দুপুরের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের একজন আগরতলা আমাদের নিয়ে গেল। ক্যাম্পে নিয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা। তার সুপারিশে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং এর অনুমোদন পেলাম। মমি মেয়েদের আশ্রয় শিবিরে অসুস্থ রোগীদের সেবার অনুমোদন পেলো। এই হলো সংক্ষেপে আমার কথা।

"স্বাধীনতার পর আমাকে খুঁজতে যাওনি?"

পরশের প্রশ্নে চোখের জল মুছতে মুছতে রাশিদুল বলে "গ্রামের নাম জানি না, মাঝির নামও। তবু নিজের আন্দাজ মতো গ্রামটা খুঁজে ঠাওর করতে পারিনি। মাঝির নাম জানা থাকলে একটা উপায় হয়ত বের হতো। ফিরে এলাম ঢাকায়।" এদিকে মমি শোকে একেবারে মানসিক রোগী হয়ে গেল। আমার পায়ে পাকবাহিনীর বুলেটের আঘাতে ক্ষত হয়ে উঠলো। চাকরিটায় অনায়াসে পূর্বের পদেই যোগ দিলাম।"

"যে বন্ধু আপনাদের গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল..." পরশের কথা শেষ না হতেই আরশাদ বলে দেশে ফিরে শুনতে পেলাম পাকবাহিনী ওকে ধরে নিয়ে গেছে। আর ফেরেনি।"

"আহ্ আরশাদ থাক থাক। পরে আরো বলা যাবে। পরশের চিন্তিত চেহারাটা? "চলো এবার আমার ফিরে পাওয়া ছেলেকে বনফুল ভাবীও হামিদ ভাইকে নিয়ে খেতে যাই।"

মমির কথায় বনফুল ও বলে প্রথম দিনে রাজ্যের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন? ছেলেকে ফিরে পেয়েছেন। চল খেতে খেতে কথা বলি।" সবাই টেবিলে আসে। মমি পরশকে বুকে জড়িয়ে খাওয়ার টেবিলের একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

"ওরে বাপরে মমি তো ছেলের জন্য রাজ্যের খাবার রান্না করেছে।" "বনফুল আপা স্বাধীনতার এতো বছর পর আমার বুকের মানিক ফিরে পেয়েছি। এ এক অনন্য ইতিহাস।"

"মুক্তি কোথায়? বোন আর ভাইয়ের দেখা যে হলো না?"

"বোন?" পরশ খেতে খেতে বলে।

"হ্যাঁ তোর একটি বোন আছে। অষ্টম শ্রেণীতে হলিক্রসে পড়ে। সাতদিনের জন্য গাইড ক্যাম্পে গেছে। দারুন চঞ্চল হয়েছে তোর বোনটি। তোর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে কথা বলে। আজ বাসায় থাকলে তোর সঙ্গে এতো কথা বলতে পারতাম না। তোকে নিয়ে ওর ঘরে গল্প জুড়িয়ে দিতো।"

"আরেকদিন এসে বোনের দেখা করে যাবো।"

"আচ্ছা পরশ মাঝিকে একবার আসতে বলা যায় না?" আরশাদ বলে।

"বাবার সঙ্গে দেখা করতে চান?"

"আমার কাছ থেকে সংক্ষেপে কিছু শুনেছিস ও আসলে বিস্তারিত জানতে পারতাম।"

হামিদুর রহমান ও সায় দিয়ে বলে "হ্যাঁ পরশ তোমার বাবাকে "বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় আমার অফিসে বলো।"

বাবাকে এখন ফোন করবো? হাতের কাজ গুছিয়ে আমার সময়টা তাকে দিতে হবে।"

"এখন পাবে?"

"পাব। তিনি রাতে আমার ফোনের অপেক্ষা করেন।" কথাগুলো বলেই পরশ পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে ফোন করে। "হ্যালো বাবা। কেমন আছো। মা ভাইয়া কেমন আছে?" ও পাশ থেকে জাব্বার বলে "তুই কেমন আছিস? ক্লাস

কেমন হলো? তোর স্যার ভাল তো? তাঁকে আমার সালাম দিস।"

"হ্যালো বাবা আগামী বৃহস্পতিবারে বিকেল পাঁচটায় স্যারের অফিসে চলে এসো। আমিও থাকবো। এসো কিন্তু বাবা। আজ রাখি। ভাল থেকো।"

রাশিদুল পরশকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—আমার হারানো মানিককে এবার বুকের ভেতর আঁকড়ে রাখবো।

"হামিদ তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি এ সুখবরটা না দিলে এ সত্য চাপাই পড়ে থাকতো।

"কৃতজ্ঞটা পরশেরই ভাল Result না করলে ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে আসতো না। আর ওর বাবা জাব্বার মিয়া যদি আমাকে সব খুলে না বলতো। যিনি জন্ম দেন তিনি ও বাবা। যিনি জন্মদাতার অবর্তমানে কোলে পিঠে মানুষ করে তিনি ও বাবা। এটা মনে রেখো রাশিদুল।"

"অনেক রাত হলো চলো এবার বাসায় যাই। পরশ বৃহস্পতিবারের আগে ক্লাসে পরে মুক্তিকে দেখে যেও।" বনফুল আদর করে পরশকে।

সবাই বিদায় নিয়ে চলে যায়। মমি পরশকে বুকে জড়িয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে বিদায় জানায়।

বাসায় ফিরে হামিদুর রহমান বসার ঘরে সোফায় শরীরটা এলিয়ে দেয়। বনফুলকে ডেকে বলে "রব্বিকে বলো এক কাপ চা দিতে। পরশ তুমি খাবে চা?"

পরশকে কথাটা বলার সময় পরশের মুখখানা আড়চোখে পরখ করে নেয়। খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে ওকে। পরশ কীভাবে বোঝাবে ওর ভেতরে ঝড় বয়ে চলেছে। হারানো মা বাবাকে এতো বছর পর ফিরে পাওয়া—কী আশ্চর্য ঘটনা। ইচ্ছে হচ্ছিল মা-বাবার বুকে মাথা রেখে প্রাণ ভরে কাঁদে।

"নাহ্ স্যার" ছোট জবাব।

দ্যাখ পরশ তুমি বড় সৌভাগ্যবান। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ বিরল ঘটনা। নিষ্ঠার সঙ্গে কত চড়াই উৎরাই পার করে এসে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস পেয়েছো। তোমার জন্য গর্বে অনুভব করি। ভাগ্য এবং কর্ম দুটোই জীবনের অংশ। তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হয়।

আমার চা শেষ। তুমি ঘুমাতে যাও। কাল ক্লাস নেই। আস্তে ধীরে ওঠো। আমিও লম্বা ঘুম দেবো।

Good night পরশ।

পরশ ঘরে ঢুকেই বালিশে মুখ গুজে হু হু করে কেঁদে উঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে "পাপা, মাম্মা তোমাদের মুখ দুখানা সারাক্ষণ মনের আয়নায় ভেসে থাকতো। তোমাদের হারানোর কষ্ট কোনদিন কাউকেই বলিনি। বুকের কষ্ট বুকে চেপে শুধু নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করেছি। গ্রামে বাবার অপার স্নেহে তাকেও কিছু বলতে পারিনি। তিনি বুকে পিঠে করে আমাকে পরম স্নেহে আমার স্মৃতিটাকে ভোলাতে চেয়েছেন।

পরশ উঠে যায় জানালার কাছে। তারাভরা আকাশটার দিকে তাকিয়ে চোখের পানিতে ভাসতে ভাসতে বিড়বিড় করে বলে "পাপা মাম্মা তোমাদের পেয়ে যাবো স্বপ্নেও ভাবতেও পারিনি। বাবা বলতেন ভাল ভাবে পড়ালেখা কর। অনেক বড় হবি তখন অনেক সত্য জেনে যাবি। বাবার উৎসাহেই পড়া ছাড়া কিছু বুঝিনি। ভাল Result না করলে ঢাকা কলেজে আসতে পারতাম না। এমন স্যারকেও পেতাম না। নানা খাতে প্রবাহিত আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটা আজ আকাশকে ছুঁতে পেরেছে। আজ পাপা আর মাম্মাকে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলা। কখন যে বুকের ভেতর কান্নার বরফ নদী গলে পড়লো নিজে ও জানি না। এখন আমি কী করবো একদিকে বাবা, অন্যদিকে পাপা মাম্মা -মাঝখানে স্যার।

কূলপ্লাবী নদী আর নৌকা নিয়ে যার কষ্টে জীবন সে মাঝি পরশের জীবনকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে এসেছে। পৃথিবীর আলো বাতাসের সৌন্দর্যের ছোঁয়া দিয়ে দিয়ে পূর্ণতা দিয়েছে। তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে "হে বিশাল সীমাহীন আকাশ আজ আমি যেন আরো পূর্ণতা পাই। আজকের আনন্দের দিনে যে আকাশ আমাকে জ্যোতির্ময় করে তোলে। আমাকে যে বহুদূর যেতে হবে। আমার বাবা চাচা, পাপা, মাম্মাও স্যারের হাত ধরে এলার দিকে যেতে চাই। আজ আমি পৃথিবীর সব চেয়ে খুশি মানুষ। ঝড়ের রাতে যাদের হারিয়েছি তাদের ফিরে পেয়ে পৃথিবীর আশ্চর্য্যতম ঘটনা ঘটিয়েছে। পাপা মাম্মাকে প্রাণ ভরে আমার উচ্ছ্বাসের কথা বলতে পারিনি। মাম্মা তোমার বুকে মাথা রেখে কত কী বলার আছে।"

ফিরে আসে বিছানায়। ঘুম আসে না। শুধু এপাশ ওপাশ।

কাল ক্লাস নেই। একটু লম্বা ঘুমাতেই হবে। মনে মনে ভাবছে নাস্তা সেরে একবার রনি, রবিকে দেখে আসবো। কিন্তু নতুন আবিষ্কারের কথা বলা যাবে না। আগে গ্রাম থেকে বাবা আসুক।

ভাল ঘুম হয়নি পরশের। সারারাত এপাশ ওপাশ করে রাত কেটে গেল। ঘুম ভাঙ্গলো বেশ সকালে। কিন্তু বিছানা থেকে উঠে ইচ্ছে করছিল না। জীবন শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর মুহূর্তটা ভাবতে ভাবতে নিজকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। চিৎকার করে বলে "আমার মতো সুখী কে আছে।" গুন গুন গাইতে গাইতে বাথরুমে ঢুকে খাওয়ার ছেড়ে আবার গায়।

"আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে।"

পরশ চিৎকার করে বলেছে মানুষ শোন আমি আমার পাপা মাম্মাকে ফিরে পেয়েছি। হৃদয়ের সকল চঞ্চলতা নিয়ে প্রাণ ভরে সাওয়ারে ভিজে বেরিয়ে আসে। পরশ নিজের লেখা কবিতার ক লাইন আবৃত্তি করে—

মুহূর্তে সমুদ্র দুলে উঠে
একটি সোনালী সন্ধ্যা
সমুদ্রের নরম ঢেউ
পরম মমতায় তুলে নিলো দুখানা হাত
এমন বিকেল আর কখনও আসেনি
নাহ্ এরকম সন্ধ্যা
আমার চোখে হরেক রকমের রং

আমার বুকে সুনীল আকাশ
আমার সম্মুখে স্বপ্নের সিঁড়ি

সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরে উঠছি পুরো ঘরটাই আনন্দে ঝলমল করে। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। ঘড়িতে নটা বাজে গেল। পরশ ঘর থেকে বেরিয়ে দেখতে পায় রাব্বি নাস্তার টেবিল সাজাচ্ছে।

"কী ভাইজান ঘুম ভেঙ্গে গেল। আজ তো ক্লাস নেই।"

"স্যার উঠেছেন?"

নাহ্। তবে ওঠার সময় হয়ে গেছে। গোসল সেরে টেবিলে আসবেন।

"চা খাবেন ভাইয়া?"

"দে"।

"পত্রিকা এসেছেরে?"

"হ্যাঁ এসেছে। সোফায় সামনে টেবিলে আছে। আপনি পত্রিকা পড়ুন। আমি চা নিয়ে আসছি।"

পরশ পত্রিকায় মন দেয়। রাব্বি চা দিয়ে যায়।

বনফুল রাব্বিকে ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই পরশকে চোখে পড়ে।

"বাবা পরশ ঘুম ভেঙ্গে গেল? ভাল ঘুম হয়েছো তো রাতে?"

"নতুন আবিষ্কারের আনন্দ উত্তেজনা সারারাত কেমন যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়েছিও।

"সত্যি তোমার জন্য এক অনন্য দিন ছিল কাল।"

বনফুল কথা আর বাড়াতে চাইলো না। প্রসঙ্গ পাল্টে বনফুল বলে—"তুমি চা খাও। দেখি তোমার স্যারের কী অবস্থা।" বনফুল উঠে যায়।

পত্রিকা পড়তে ও মন বসে না পরশের। বারবার মনে পড়ছে গতকাল সন্ধ্যার আশ্চর্য্যতম আবিষ্কারের কথা। ঘর্মাক্ত হয় পরশ।

"পরশ টেবিলে এসো। নাস্তা খাবে না?" হামিদুর রহমানের ডাকে চমকে উঠে পরশ।

"আসছি স্যার" পরশ নাস্তার টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসে। ওর মনে পড়ে গ্রামে মাদুর পেতে খাবার খেতো।

"কী ভাবছো পরশ?" হামিদুর রহমান কথাটা হেসে বলে "রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ স্যার। তবে তেমন ভাল ঘুম হয়নি।"

হামিদুর রহমান বুঝতে পারেন। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলেন "তোমার জন্য এটি অভাবনীয় ঘটনা।"

"হ্যাঁ স্যার ঠিক বলেছেন। আমি স্বপ্নে ও ভাবিনি পাপা মাম্মাকে ফিরে পাবো।"

"তোমার বাবা আমাকে কথাগুলো না বললে এ নাটকীয় ঘটনা ঘটতো না। রাশিদুল আমার বন্ধু। রাশিদুলকে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি। তোমার হারানো মানিক ফিরে পাবে এটি তো আমাদের জন্যও আনন্দদায়ক। ছেলে হারিয়ে রাশিদুলের স্ত্রী মানসিক রোগী হয়ে গেল। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও কিছু হলো না। তখন ডাক্তার

বলে আপনারা আরেকটা বাচ্চা নিন। ফল ভাল হতে পারে। মা বাবার জন্য পুত্রশোক বড় শোক। যদি আরেকটা সন্তান হয় পুত্র শোক না গেলেও আরেকটা সন্তান এলে মমির মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। রাশিদুল প্রথম দিকে রাজী হচ্ছিলেন না—আমিই অনেক বুঝিয়ে রাজী করলাম। ওদের ঘরে এল মুক্তি। কিন্তু পুত্র শোকটা ওদের রয়ে গেল। তোমার কথা শুনে বাবার কাছে ছেলে ফিরিয়ে দেবার জন্য রাশিদুলকে সব খুলে বলতে বাধ্য হয়েছি।"

"স্যার সব কিছু আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।"

বনফুল নাস্তার টেবিল গোছাতে গোছাতে বলে-"দ্যাখ হামিদুর এসব আলোচনা এখন থাক না। ছেলেটার উপর কী মানসিক চাপ যাচ্ছে। কাল রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারেনি। এখন থাক ওসব কথা।"

হামিদুর রহমান অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। বলে "আজ তো ছুটির দিন। কী করবে আজ।"

"আপনার বুক সেলফে অনেক বই। একটা বই নিয়ে পড়তে পড়তে হয়ত ঘুমিয়ে পড়বো।"

"হ্যাঁ তাই করো। আমি একটু বের হবো।"

হামিদুর রহমানের মোবাইল ফোন বেজে উঠলো।

"হ্যালো। আরে রাশেদুল যে।"

"নাস্তার পাঠ চুকলো পরশ বাবাজিকে নিয়ে।"

"হ্যাঁ জমপেশ আড্ডা মেরে নাস্তা শেষ হলো।"

"পরশ বাবাজি কেমন আছে?"

"পরশের সঙ্গে কথা বল।"

হামিদুর ফোনটা পরশকে দেয়।

"হ্যালো পাপ্পা। পরশ আবেগে কেঁদে ফেলে।"

অনেক কেঁদেছিস। আর নয়। তোর স্যার না হলে তোকে পেতাম নারে। তোর মাম্মা কাছে নেই। ওকে ফোনটা দিলাম না। কথা বলতে গিয়ে হাউমাউ করে কান্নাকাটি শুরু করবে। কাল রাত তোর ঠিকমত ঘুম হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ হয়েছে কোন রকম।"

"হামিদুরকে ফোনটা দে।"

পরশ হামিদুরের হাতে ফোনটা দিয়ে সরে যায়।

"শোন হামিদ বনফুলকে দুপুরের রান্না করতে বারণ কর। মমি রান্না করে নিয়ে আসবে। আমরা সবাই দুপুরে খাবো। আজ আমার ছুটি। ব্যাঙ্ক বন্ধ। দিনটা তোদের সাথে কাটাই। পরশকে বলিস না। ওকে সারপ্রাইস দেবো। বনফুলকে বলে দিস।

ফোন কথা শেষ করে হামিদুর বলে আমাকে এখনি বের হতে হবে। একটার মধ্যে ফিরতে হবে। বাসায় মেহমান আসবে। বলেই ভেতরে যায়। পরশ কিছুই বোঝে না। বসার ঘরের বুক সেলফ থেকে একটা বই নিয়ে ঘরে চলে যায়। পরশ ভেবেছিল বলবে একবার চাচার বাসায় ঘুরে আসবে। দুপুরে চাচীর বাসায় খেয়ে রনি, রবির সঙ্গে গল্প করে বিকেলে ফিরবে। স্যারের অনুমতি নিতে চেয়েছিলেন। পারলো না। স্যার যে ভাবে তড়িঘড়ি করে ঘরে চলে গেলেন—বলার সাহস হয়নি।

বরং হাসনাত আবদুল হাইয়ের লেখা 'সুলতান' বইখানা নিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসে। এক সময় পরশ বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হামিদুর বের হবার সময় বনফুলকে শুধু বলে যায় "মমি রান্না করে নিয়ে আসবে। দুপুরে আমরা এক সঙ্গে খাবো। পরশ জানে না। তুমি বিকেলের জন্য কিছু নাস্তা করে রেখো। আমি ফিরে আসবো তাড়াতাড়ি।"

মমি ও ঘর গোছানো সাজানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাব্বিকে নিয়ে বিকেলে নাস্তার কাজটাও সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সময় গড়িয়ে যায় দ্রুত।

একটা বাজতেই রাশিদুলও মমি দুই টিফিন ক্যারিয়ার ভরে খাবার নিয়ে হাজির। আচ্ছা মমি রান্না করে নিয়ে আসার কী দরকার ছিল। আমি বুঝি রান্না করতে পারতাম না? বুঝতে পেরেছি ছেলেকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে সঙ্গে আমরা।

"আসলে তা নয়। ভাবলাম রাশিদুলের আজ ছুটি। কিছু রান্না করে সবাই মিলে খাই। গতকাল পরশ আবেগের কারণে কিছু খায়নি। দীর্ঘ বছরের ব্যবধান তো বুঝতে পারছি এটি স্বাভাবিকই বটে। তোমার সঙ্গে নিশ্চয় পরশ এতোটা আড়ষ্ট নয়।"

"হামিদুর ওর স্যার একটু লজ্জায় থাকে। কিন্তু আমার সঙ্গে ফাঁক পেলেই আমার কবিতা আবৃত্তি শুরু করে। ভাবতে অবাক লাগে গ্রামে পড়ুয়া ছেলের এতো জ্ঞান।"

"পরশ কোথায়?" মমি জানতে চায়।

"দেখলাম নাস্তা খেয়ে বুক সেলফ থেকে একটা বই নিয়ে ঘরে গেল। আমিও কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।"

"ডাক দাও না ওকে।"

"বনফুল হাসতে হাসতে বলে তুমিই ডাকবে।"

রাশিদুল সায় দিয়ে বলে "এতো বছরে একটা দূরত্ব হয়েছে মানি। কিন্তু মমি এ দূরত্ব আমাদেরকে দূর করতে হবে। যাও তুমিই ডেকে নিয়ে এসো।"

"যাও যাও মমি ডাক ওকে। ততোক্ষণে আমি খাবার টেবিলটা সাজাই। ওকে পাশে বসিয়ে গল্প করো। হামিদও এখনি চলে আসবে।"

"মমি উঠে যায়। দরজায় টোকা মেরে বলে বাবা পরশ।" মুহূর্তে পরশের ঘুম ভেঙ্গে যায়। কণ্ঠ স্বরেই বুঝে ফেলেছে কে উনি। পরশ তাড়াতাড়ি শার্টটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

"মাম্মা কখন এলে? বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পাপ্পা এসেছেন।?"

চল বসার ঘরে দেখবি পাপ্পাকে।

পরশকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে আসে বসার ঘরে।

পরশ মনে মনে ঠিক করে আজ কোন আবেগ নয়। শুধু আনন্দ প্রকাশ।

পরশ রাশিদুলকে দেখেই বলে উঠে "পাপ্পা! মাম্মা! কখন এসেছো? আমি জানলাম না। রাশিদুল পরশকে জড়িয়ে পাশে বসায়। পিঠে হাত বুলিয়ে বলে আজ আমার ছুটির দিন। ভাবলাম তোকে দেখে যাই। দুপুরে তোর সঙ্গে যাবো। মমি ও বসে পরশের পাশে।

"কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছে?"

"পাওয়ার আনন্দে ভাল ঘুম হয়নি। এই তো দেখ না সকালে নাস্তা খেয়ে একটা বই নিয়ে পড়তে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আন্টি কী জানেন আপনারা এসেছেন?"

"জানে জানে বনফুল হামিদ জানে আমরা আসবো।"

"কিন্তু স্যার তো বাইরে গেছে।"

"এই যে আমি এসে গেছি। পরশ তোমার পাপ্পা মাম্মা কী করেছে জান?"

"কী স্যার?"

"সবার জন্য রান্না করে এনেছে। আমরা এক সাথে খাবো বলে।"

"বাহ্ আনন্দের ব্যাপার তো!"

"দ্যাখ এ ল্যাপটপটা তোর জন্য এনেছি। তোর কাজে লাগবে। তোর মাম্মা কটা শার্ট এনেছে।"

"কী দরকার ছিল পাপ্পা। এতো কিছু পেয়ে তো বড় হইনি।"

"তুই আমাদের কাছে সেই আগের ছোট মনি রয়েছিস। কিন্তু "জানিস বাবা বিশ্বাস হচ্ছে না আমাদের সোনার মানিক ফিরে পাব।" মনের ভেতর তোমাদের ছবি সযতনে রেখে সঙ্গোপনে কঠিন পথ অতিক্রম করেছি।"

এ কঠিন পথ চলার কারণেই তুই একাগ্রভাবে পড়ালেখা করে ভাল Result করেছিস। ঢাকা কলেজে ভর্তি না হলে তোকে ফিরে পেতাম না। হামিদুরের কাছে তোর বাবা সব খুলে না বললে আমরা তো কিছুই জানতাম না। হামিদুর ও আমরা ছোটবেলার বন্ধু। ও যখন আমাদের বিষয়টি বিস্তারিত জানালে প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না। শুধু দিন গুনেছি কবে দেখবো তোকে।"

স্যার আমাকে কিছুই বলেননি। বুঝতে পারছি তিনি আমাকে অবাক করে দিতে চেয়েছেন।

হামিদ ঘর থেকে কাপড় বদলিয়ে বসার ঘরে আসতে আসতে পরশের কথাটা শুনে বলে—"তোমার ভর্তির ঝামেলা শেষ হবার অপেক্ষা করেছি। কাল থেকে তোমার ক্লাস শুরু। পাওয়ার আনন্দে ডুবে না থেকে মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। H.S.C তে আরো Result করতে হবে।"

"জ্বি স্যার।"

"পরশের মাম্মা পরশের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জানতে চায় গ্রামে সময় কাটতো কীভাবে বাবা?"

"সময়ের সাথে পাল্লা দিকে হয়রান হয়ে যেতাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দু ভাইকে মাদ্রাসায় কোরান শিক্ষার জন্য যেতে হতো। এক ঘণ্টা পড়ে বাড়ি ফিরে স্কুলের পড়া বাকি থাকলে তা পড়ে নিতাম। তারপর গোসল সেরে গরম ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়া। এক মাইল হেঁটে স্কুলে যেতে হতো। চারটা পর্যন্ত ক্লাস চলতো। তবে হাতে সময় থাকলে স্যারদের কাছে সাহায্য নিতাম। কারণ বাবার তো প্রাইভেট টিউটর রাখার সামর্থ ছিল না। ফাঁকে কম্পিউটার শিখতাম। অল্প সময়তেই কম্পিউটার আমি ভাল করলে জুনিয়ার ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্ব পাই। সপ্তাহে তিন দিন। কম্পিউটারে পারদর্শী হবার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাকে উপহার ও দেয়। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম ক্লাস পর্যন্ত ক্লাসে প্রথম হবার সৌভাগ্য জোটে। আর সে

কারণেই বোধ হয় মেট্রিক জি. পি. এ পাঁচ পাওয়ার জেদ বেড়ে যায়। এতে বাবা মার উৎসাহের অন্ত ছিল না। তাদের অবদান আমার জীবনে অপরিসীম।"

বাহ্ পরশকে পেয়ে খাওয়ার কথা ভুলে গেলে? চলুন আপনারা খেতে চলুন। মমি এতো রান্না করে এনেছো। একবেলা খেয়ে তো শেষ করা যাবে না। রাতেও বেয়ে যেতে হবে। বনফুলের কথায় মমি হেসে বলে "কী-ই-বা রান্না করে আনলাম এতো প্রশংসা?"

খাওয়া সেরে আবার বসার ঘরে জমপেশ আড্ডা আড্ডার বিষয় রাজনীতি। হামিদুর রাশিদুল দুজনই বঙ্গবন্ধুর ঘোর ভক্ত। পরশও। কিন্তু পরশ রাজনীতির কিছুই বোঝে না। বোঝে শুধু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিপক্ষের শক্তি কারা। পরশ চুপচাপ রাশিদুল ও হামিদের যুক্তি তর্ক মন দিয়ে শোনে। পদ্মাসেতু, তিস্তাচুক্তি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এ প্রসঙ্গে তুমুল আলোচনা চলে। হামিদুর রাগতস্বরে বলে '৭৫ এ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা না করলে এতোদিন সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যেতো। যুদ্ধপরাধীদের বিচারও হতো। শেখ হাসিনা যখন এ বিচারের কাজে হাত দিয়েছেন এ বিচার হবেই।

বনফুল ও মমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। "একি তোমরা যে দেখছি রাজনীতি আলোচনায় মগ্ন।" বনফুলের কথায় মমি ও সায় দেয়। "পরশের সামনে বসে রাজনীতির আলোচনায় ওকি তোমাদের এসব বুঝে?"

"রাজনীতি বুঝি না ঠিক শুনতে আপত্তি কী।" পরশ হাসতে হাসতে বলে। তাতে অনেক কিছু শেখা যায়। কী মাম্মা কী বলো?"

"চা দেবো?" বনফুল জানতে চায়।

হ্যাঁ দাও। লনে দিতে বলো। হামিদুর কথাটা বলে রাব্বিকেই ডেকে বলে লনে চা-নাস্তা দিতে।

সবাই উঠে যায় লনের দিকে। রাব্বি ট্রে করে চা নাস্তা নিয়ে আসে। চা খেতে খেতে বনফুল বলে "তোমরা কী জান পরশ কবিতা লেখে।"

আর এজন্যই বনফুলের সঙ্গে তোমার আলাপচারিতা বেশি। কারণ তুমিও কবিতা লেখো।"

আন্টি আমাকে লজ্জায় ফেলছেন। আমার কবিতা কবিতা নয় মনের কষ্টকে প্রকাশের চেষ্টা মাত্র। দুঃখটা ভুলে থাকতে চাই শুধু। পরশ লজ্জায় মাথা নিচু করে বলে।

"পরশ তোমার একটা কবিতা শোনাও তো তোমার পাপা আর মাম্মাকে।"

আজ নয় আন্টি। অন্য আরেক দিন।

রাশিদুল পরশের কাঁধে হাত রেখে বলে "একটা কবিতা শোনাও শুধু। অন্য এক ছুটির দিনে আমার বাসায় কবিতার আসর জমাবো।"

মমি ও সায় দেয় রাশিদুলকে সমর্থন করে পরশকে জড়িয়ে বলে বাবা শোনাও না।

আমি তো সে অর্থে কবিতা লিখি না। বনফুল আন্টি জাত কবি। তাঁর কবিতা আমার ভাল লাগে। আমি ২/১টা যা লিখি সেগুলো কবিতা নয়। কষ্ট থেকে বাঁচবার জন্য বলেই পরশ দু লাইন বলে—

তোমাদের মুখ ছবি
যখন আকাশের তারার মেলা বসাও
তখন হয়ে যাও বাংলার কবিতা
তোমাদের অবিচল উৎসরণ
আমাকে ছুঁয়ে যায় বার বার।

দেখেছো কী সুন্দর কবিতা? মমি পরশকে জড়িয়ে ধরে। পরশ লজ্জা পায়।

"এ লেখায় অভ্যাস ছেড় না বাবা।" রাশিদুল বলে।

"চারটা বাজে বাসায় যাবে না?"

মমির কথায় রাশিদুল ঘড়ির তাকিয়ে সায় দেয়। "হামিদ আজ আমরা উঠি। পরশ বাবাজি কী কোথাও বের হবে?" আমতা আমতা করে পরশ বলে "চাচার বাসায় যেতে চেয়েছি। এখানে আসার পর চাচী চাচাত ভাইদের দেখতে যাইনি।"

"খুব ভাল বলেছো। তা একটা কাজ করো। আমাদের সাথে চলো গাড়ি আমাদের নামিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবে।"

রাশিদুলের কথায় পরশ বিনয়ের সাথে বলে—"এখানে আসার পর চাচার বাসায় যাইনি। ভাবছি চাচার বাসায় যাবো।"

"তবে চলো আমাদের বাসায় নামিয়ে গাড়ি নিয়ে যাও।"

রাশিদুলের কথায় পরশ বিনয়ের সঙ্গে বলে "ঢাকা শহরে এ প্রথম আসা। ঢাকা শহরের রাস্তা ঘাট দেখতে দেখতে চলে যাবো। ফুটপাত ধরে হাঁটতে খুব ভাল লাগে। আমি চলে যেতে পারবো।"

"রাত করো না বাবা।" বনফুল বলে।

"আন্টি আপনার মোবাইল নাম্বার দেবেন? দেরী হলে আপনাকে জানাতে পারবো।"

বনফুল নাম্বারটা দেয়।

সবাই উঠে দাঁড়ায়। মমি পরশকে দাঁড়িয়ে আদর করে।

"আবার কবে দেখা হবে?" মমির কথায় পরশ মাকে জড়িয়ে বলে একবার যখন খুঁজে পেয়েছি। ছাড়ছে কে?"

রবি, সোম, মঙ্গল এক টানা ক্লাস নিয়েই ব্যস্ত ছিল পরশ। ফাঁক পেলে লাইব্রেরিতে সময় কাটায়। বিকেলে সময় মত বাসায় ফিরে বনফুলের সঙ্গে বসার ঘরে নানান কথা।

"জানেন আন্টি ঢাকা কলেজ আমার জীবনটা পাল্টে দিয়েছে। আরো পাল্টেছে আপনার স্নেহ আর স্যারের ভালবাসা। স্যারের আন্তরিক অভিভাবকত্ব এখানে নিয়ে আসা আমার অসুন্দর পৃথিবীটা পাল্টে গেল। জ্ঞান হওয়ার পর যে যন্ত্রণা নিয়ে দিন কেটেছে যন্ত্রণার জাল ছিঁড়ে স্যারের আপনার সুবাদে আমার হারানো জিনিস ফিরে পেয়েছি। আমার জীবনের পরম ধন।"

"এটিই তোমার ভাগ্যে লেখা ছিল। এমনি করেই যুদ্ধে যুদ্ধে চলতে চলতে জীবনের পরম সত্যটা কেমন করে আবিষ্কার হয়ে গেল। সত্য কখনও চাপা থাকে না। দ্যাখো তুমি যে পরিবেশে বড় হয়েছো তুমি অন্য রকম ছেলে হতে পারতে। যেমন বখাটে উচ্ছৃঙ্খলতার পথই হতো। তোমার মা-বাবার প্রতিনিয়ত আশীর্বাদের কারণেই তুমি সোনার ছেলে হিসেবে বড় হয়ে উঠেছো। তুমি অনেক বড় হবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরশ উর্ধ্বপানে তাকায়। বনফুল পরশকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরে। বনফুল আবৃত্তির ঢঙে বলে "পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা আনন্দে তাই এক হল তাঁর পৌছানো আর চলা।"

পরশ বিস্মিত হয়ে শোনে। বাকরুদ্ধ হয়ে যায় তার। আর অমনি অধ্যক্ষ সাহেব ঘরে ঢোকেন। "কী ব্যাপার আমাকে ফেলে বিকেলের চা শেষ?"

"আরে নাহ্ তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। পরশের সাথে গল্প করছিলাম।"

"তা পরশ কেমন লাগলো তোমার একটানা ক্লাস?"

খুব ভাল স্যার। আমি যথাসাধ্য সব চেষ্টা করছি ক্লাসের পাঠ টুকে নিতে এবং শুনতে। ইতিমধ্যে লাইব্রেরিতেও এ বিষয়ে নোট তৈরি করতে চেষ্টা করেছি। খুব ভাল লাগছে স্যার।"

"যাও ফ্রেস হয়ে এসো। আমি নাস্তা দিচ্ছি।" বনফুল বলে। পরশ টেবিলে রাখা মেগাজিনে মন দেয়। দিনে দিনে প্রতিদিনে হালকা বোধটা বাড়ছে। পরশ মনে মনে বলে "হায়রে উপর অলার ইচ্ছে।"

অধ্যক্ষ হামিদুর রহমান ফ্রেস হয়ে বসার ঘরে এসে বসে। পরশের দিকে তাকায়—ধীর কণ্ঠে পরশকে জিজ্ঞেস করে "বাড়িতে খবর দিয়েছো?"

"জ্বি দিয়েছি। বাবা বৃহস্পতিবারেই আসবেন। ঠিক পাঁচটায় ঠিক আপনার অফিসে থাকবেন।"

দাঁড়াও রাশিদুলকে জানিয়ে দিচ্ছি। "হ্যালো রাশিদুল বৃহস্পতিবারে পরশের পালক বাবা বিকেল পাঁচটায় আমার অফিসে আসবে। সেখান থেকে তোমার বাসায় নিয়ে আসবো। পরশ ভাল আছে। মন দিয়ে ক্লাস করছে, পড়ছে, Note তৈরি নিয়ে ব্যস্ত। পরশের সঙ্গে কথা বলবে?"

"কেমন আছিস বাবা? ইচ্ছে হয় তোকে বুকে চেপে রাখি আর তোর কষ্টগুলো নিজের বুকে নিতে।"

"আমি ভাল আছি পাপ্পা তোমাদের বুকের উত্তাপ নিতে। হবে হবে সব হবে। আমি সে অপেক্ষায় আছি।"

"কাল বিকেলে আমার সঙ্গে চা খাবে?"

"জ্বি খাবো। নিশ্চয়ই আসবো। আর বৃহস্পতিবারে তো বাপজান আসছেন। তাঁকে আমি কিছুই বলিনি। আপনার ওখানে গেলে তিনি সব জানতে পারবেন। দেখা যাক তখন কী হয়। মাম্মা কেমন আছেন? মাম্মাকে বলবেন সেই চমৎকার পায়েস চাই।"

ওপাশ থেকে হো হো করে হেসে উঠেন আরশাদ।

নানান কথায় বসার ঘর সরগরম হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শেক্সপিয়ার, জুলভার্ন এসব বিখ্যাত লেখকদের নিয়ে পরমের সঙ্গে আলাপ করে হামিদুর রহমান

বিস্মিত। তাঁদের উপর পরশের এতো পড়াশোনা!! ছেলেটি সত্যিই ব্রিলিয়েন্ট। পরশের মাথায় রেখে তিনি বলেন "তুমিই বাংলার সোনার ছেলে।"

রাতের খাবার খেয়ে পরশ ঘরে যায়। বই খাতা নিয়ে পড়তে বসে ও মন বসে না। মাঝে মাত্র একটি দিন। তারপর গ্রাম থেকে আসবেন তিনি যিনি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছেন। সেই মানুষটি যখন সব সত্য জানবেন তখন কী হবে।

ছোটবেলার কত স্মৃতি ছবির মতো ভেসে উঠে। বুকে কষ্ট চাপা দিয়ে কীভাবে কষ্টের নদী পেরিয়ে আজ বিরাট সত্যের মুখোমুখি হবার অবস্থাটা কী হবে। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কি করবেন আরশাদ হোসেন সবুর মোল্লা বা স্বয়ং পরশ।

এই জব্বার মিয়া কোথা থেকে এল?

বাতিটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ে পরশ। নাহ্ ঘুম আসছে না। হাজার চিন্তা. হাজার স্মৃতি ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। একটা দিন পেরিয়ে গেলে পরশের Destination কী হবে? সারা রাত ছটফটিয়ে নির্ঘুম রাত কেটে গেল। ভোর হতেই উঠে জানালার কাছে দাঁড়ায়। শীতের কুয়াশার চাদরে ঢাকা গাছ দুর্বাঘাস। হিমেল হাওয়ায় পরশের শরীরটা হিমেল হয়ে উঠে। কী সুন্দর নির্মল আকাশ। নিস্তব্ধ হিমেল সকালে ও নানান ভাবনায় পরশের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে। চোখের জলে শীতের কুয়াশার মত জল পরশের চোখ ভিজে যায়। ইচ্ছে হয় চিৎকার করে কাঁদে। এ কান্না হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার। সবুর মিয়া সারা জীবন পরশের পিতার আসনে থাকবেন। তাঁর প্রতি কর্তব্যের অবহেলা করবেন না। মা চাচা চাচী রবি, রনি, রুহিন, পরশের আবিচ্ছেদ্য অংশ। ছেলে হিসেবে ভাই হিসেবে সারা জীবন দায়িত্ব সবই করবে। আরো কত কী ভাবে পরশ। জানালায় ফাঁক দিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে পরশ "হে আকাশ তোমার মত আমাকে নির্মল সুন্দর করো।

বৃহস্পতিবার বিকেল ঠিক পাঁচটায় পরশ সবুর মোল্লাকে নিয়ে অধ্যক্ষের ঘরের সামনে দাঁড়ায়। সবুর মিয়া তখন ও জানে না কী হতে চলেছে।

"তুই কী দোষ করেছিস যে তোর স্যার সরাসরি আমাকে ডেকে পাঠালেন?"

"নাহ্ আমি কোন দোষ করিনি বাবা। তিনি হয়ত জরুরি কথা বলবেন। খাবড়াবাবার কিছু নেই। হয়ত আমার প্রশংসাই করবেন। চলো ভেতরে যাই।"

ওরা দুজনে ধীর পায়ে ভেতরে প্রবেশ করে। হাত তুলে সালাম জানায় অধ্যক্ষকে। অধ্যক্ষ সবুর মিয়াকে দেখেই চেয়ার থেকে উঠে সামনে এগিয়ে যায় আর সবুর মিয়াকে জড়িয়ে ধরেন।

আপনাকে দেখার জন্য অনেক দিন ধরে মনটা ছটফট করছে। তাই পরশকে বললাম আপনাকে আমার জন্য বলি। একটি পরশ পাথর খুঁজে পেয়েছেন আপনি। আপনি ওকে পরম স্নেহে আলো দিয়ে বড় করেছেন।" অধ্যক্ষ ফলেই কথাগুলো বলতে সবুর মিয়াকে সসম্মানে একটি চেয়ারে বসিয়ে নিজের চেয়ারে বসেন।

"আপনি চেয়ারে বসিয়ে নিজের চেয়ারে বসেন। আপনি কেমন আছেন স্যার?" সবুর মিয়ার প্রশ্নে অধ্যক্ষ হো হো করে বলেন "এমন একটি রত্ন আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। সে তো লেখাপড়া ছাড়া কিছুই বোঝে না। নিন চা খান।" "স্যার আমি অফিস রুমে বসি। প্রয়োজনে ডাকবেন।" এ কথা বলে পরশ বেরিয়ে যায়।

"স্যার ছেলেটা ঠিকমত ক্লাস পড়ালেখা করছে তো? নতুন জায়গা নুতন মানুষ সব মিলিয়ে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে তো?"

"সোনার টুকরা ছেলে তৈরি করেছেন। পড়া আর ক্লাস ছাড়া কিছুই বোঝে না সে। তবে ওর ভেতর একটা চাপা কষ্ট আছে বোঝা যায়।"

অধ্যক্ষের কথায় সবুর মিয়া বলে "আপনাকে তো সেদিন সবই খুলে বলেছি। ওর হারানো বাবা মার অভাবটা ওকে কষ্ট দেয়। খুব চাপা স্বভাবের ছেলে। ওর ধারণা কোন একদিন ওর বাবা মাকে ফিরে পাবেই। তা কী সম্ভব স্যার?"

"ওর এ ভাবনা অসম্ভব কিছু নেই। কিন্তু আপনি তো ওকে বুক আগলে বাবার মতই বড় করেছেন। আপনার গর্ব হয় না?"

তাতে হয়। বাবা মায়ের অবর্তমানে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার স্ত্রী ও তাই করেছে। নিজের এক মার ছেলের চাইতে পরশের প্রতি পক্ষপাতিত্বটা চোখে পড়ার মত ছিল। কিন্তু ওর ভেতরের কষ্টটা দূর করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ কষ্ট নিয়েই ওকে সামনে এগুতে হবে। আমি পরম নিশ্চিত পরশ আপনার কাছে ভাল থাকবে। বাস্তবটা ও হয়ত একদিন মেনে নিতে বাধ্য হবে।"

"শুনুন সবুর সাহেব আমার এক বন্ধু আছে। আপনার অনুমতি ছাড়াই ওকে পরশের ব্যাপারটা বলেছি। পরশকেও নিয়ে গিয়েছিলাম ওর বাসায়। আমার বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় বলেই আজ আপনাকে আসতে বলা।" চলুন।

"অধ্যক্ষ বনফুলকে কেমন করে বলে—"আমরা রওনা দিচ্ছি।

তোমাকে তুলে আমরা যাবো।"

অধ্যক্ষ কলিং বেল টিপে পিয়নকে ডাকে—"অফিস রুমে পরশ নামে একটি ছেলে আছে। ওকে আসতে বলো।"

খবর পেয়েই পরশ অফিস ছুটে আসে।

তোমার তো চা খাওয়া হয়নি। চলো ঐ বাসায় যাই। ওখানেই চা খাবে। আজ তোমার আনন্দ আর গৌরবের ফল। বনফুলকে তুলে চলো যাই।"

অধ্যক্ষ লক্ষ্য করেন পরশের চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চোখের পাঁপড়ি ভিজে উঠছে। অধ্যক্ষ সব বুঝে-ও-না বোঝার ভান করে উঠে দাঁড়ান। এক হাতে পরশকে অন্য হাতে। সবুর মিয়াকে গাড়ির দিকে এগিয়ে যান। গাড়িতে উঠে পরশের হাতটা নিজের হাতে তুলে অধ্যক্ষ বলেন।

"অনেক দিন পর বাবাকে দেখে কেমন লাগছে?"

"খুব ভাল।" সংক্ষেপে উত্তর।

"আমার পরশ মায়ের বড্ড ভক্ত। সাপ্তাহিক ছুটিতে চলে আয় গ্রামে। তোর মা তোর জন্য বড্ড মন খারাপ করে। চলে আয় কোন এক সাপ্তাহিক ছুটিতে।"

সবুরের কথায় পরশ মাথা নেড়ে সায় দেয়।

সময় মত বনফুলকে তুলে নেয় ওরা। বনফুলের হাতে অনেক ফুল কেকের বাক্স।

ধর একটু। স্বামীর হাতে কেকের বক্স দিয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে গাড়িতে উঠেই বলে।

"আপনিই বিখ্যাত সবুর সাহেব। অনেক শুনেছি আপনার কথা।"

সালাম জানিয়ে সবুর বলে—

"বিখ্যাত হবার কোন গুণ তো আমার নেই। গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ আমি। আমার পরশের জন্যই আপনাদের মত বড় মানের মানুষের সঙ্গে পরিচয়। আপনারা পরশের জন্য যা করছেন এখন শোধের নয়।"

"কে কার ঋণশোধ করবে তা সময়ই বলবে" বনফুলের কথার অর্থ কিছুই বোঝে না। শুধু বিনম্র হাসে।

পরশের ভেতরে ঝড় বয়ে চলে। ভাবে আজকের পরিবেশ পরিস্থিতি কোথায় পৌঁছবে কে জানে। গাড়ি যত দ্রুত চলছে পরশের বুকের ধড়ফড়ানিও বাড়ছে। পরশ কী করবে তখন?

"সত্য যে কঠিন

কঠিনেরে ভালবাসিলাম।" পরশ মনে মনে বলে।

গাড়ি এসে থামে আরশাদ সাহেবের বিশাল গেইটের সামনে। দারোয়ান দরজা খুলে অধ্যক্ষ হামিদুর রহমানকে দেখেই লম্বা সালাম ঠুকে গেইটটা খুলে দেয়। গাড়ি এসে থামে বিশাল বাড়ির সামনে। সবাই গাড়ি থেকে নামে। কলিং বেল টিপতেই বাড়ির বয় দরজাটা খুলে দেয়। বয় লম্বা সালাম দিয়ে বলে বসুন স্যার আমি স্যারকে ভেতরে খবর দিচ্ছি। বড় সাজানো বসার ঘরে সবাই বসে। সবুর এতো বড় সাজানো বসার ঘর দেখে অবাক বিস্ময়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। দু চোখে পড়ে পাশের দেয়াল জুড়ে পরশের ছোট বেলার ছবি। (যে বয়সে নৌকাডুবি হয়েছিল ঠিক সে বয়সের ছবি) পাশে আছে পরশকে কোলে নিয়ে আরশাদ সাহেব ও তার স্ত্রীর ছবি। দীর্ঘ বছর পেরিয়ে গেলে ও সবুরের স্মৃতিতে সব জ্বলজ্বল করছে। জব্বারের স্মৃতিতে এখনও অমলিন সে চেহারা। সবুর মিয়া ঘমাক্ত হচ্ছে। একি স্বপ্ন না বাস্তব! কোথায় এলাম আমি?

আরশাদ সাহেব বসার ঘরে এসে সবুরের দিকে তাকান।

"চিনতে পেরেছেন?" আরশাদ সাহেবের প্রশ্ন।

সবুর মিয়া উঠে এগিয়ে আসে আরশাদ সাহেবের কাছে। সবুর মিয়া আরশাদ সাহেবকে জড়িয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলে।

আমাকে ক্ষমা করুন স্যার। সে ঝড়ের রাতে আপনাকে বাঁচাতে পারিনি। ডুবে ডুবে কোন ভাবে পরশকে বাঁচাতে পেরেছি। কাত করা নৌকায় পরশকে বসিয়ে আবার পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আপনাদের খোঁজার সুযোগ পাইনি। কারণ নৌকা থেকে যদি আবার পরশ পড়ে যায়। তাছাড়া পরশ চিৎকার করে পাপা, মাম্মা বলে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। অনেক কষ্টে পরশকে মিথ্যা বলে কাত করা নৌকাটা নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে সামনে এগুতে এগুতে ভোর হয়ে গেল। অনেক কষ্টে নৌকাটা নিয়ে পাড়ে ভিড়লাম। পরশকে বুকে ছড়িয়ে বাড়ি ফিরলাম। পরশের কান্না থামে না। কিছু খায় না। ওকে সামাল দিতে আমিও আমার স্ত্রীর হিমসিম খাওয়ার অবস্থা। কত মিথ্যা সান্ত্বনা। কত মিথ্যা বলা। বলতাম তুমি বড় হলেই মা বাবার কাছে যেতে পারবে। খেতে হবে। ঘুমাতে হবে। লক্ষ্মী ছেলে সবুর করো। ভাগ্যের অপার মহিমা! দিন যায় দিন আসে। পরশ বোধ হয় আমাদের কথা বিশ্বাস করেই একেবারে শান্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র আমার মহিমা পরশ বড় হয়েছে পরশের হাতটা ধরে আরশাদের হাতে তুলে দিয়ে আপনার ছেলে আপনার হাতে তুলে দিতে পারলাম। সবই সম্ভব হয়েছে এই অধ্যক্ষ স্যারের জন্য।

মমি পাশে এসে দাঁড়ায়। সবুর হাত জোড় করে বলে "আপনারা আমার মাটির ঘরে কত কষ্ট করে ছিলেন। '৭১এ মুক্তিযুদ্ধে কত মানুষ সীমান্তে পার করে দিয়েছি। কিন্তু আপনাদের মতো কাউকেই হারাতে হয়নি। আজ আপনাদের ফিরে পেয়েছি, পরশ তার পাপা আর মাম্মাকে ফিরে পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তা বিরল। পরশ মুক্তিযুদ্ধের সোনার ছেলে।" বলেই সবুর মিয়া হু হু করে কেঁদে ওঠে। নাহ্ নাহ্ আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। এ কান্না আনন্দের কান্না। পাওয়ার কান্না।

মমি আরশাদ পরশকে বুকে জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে উঠে। সবুর মিয়াকে কাছে টেনে নেয়। "আপনার জন্যই আমার হারানো মানিককে ফিরে পেয়েছি। আরেকজন হল আমার পরম বন্ধু হামিদুর। আরশাদ ছুটে যায়। হামিদুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে তুমি আমাকে এ খবর না দিলে আমি আমার সোনার ছেলে ফেরত পেতাম না।"

বনফুল ফুলগুলো আরশাদ, মমি সবুর ও পরশের হাতে তুলে দেয়। বলে "আর কান্না নয়। এবার হাসো। পরশ আরশাদ, মমি সবুরের মিয়ার ছেলে। একজন জন্মদাতা আরেকজন লালন পালন করে বড় করেছো। পরশ বুঝেছো?"

পরশ মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আরে আরে পরশ কান্না কিসের? মুক্তিযুদ্ধের কত সন্তান বাবা মা হারিয়েছে। তুমি পেয়েছো দুজন মা, দুজন বাবা। এটি তোমার জন্য কত আনন্দের।

মমি বলে কেকটা তোমরা তিনজনে কেটে এ দিনটি সেলিব্রেট করো। মমি ছুটে একটা ছুরি এনে সবুরের সামনে ধরে। নিন আপনি ধরুন। আমরা ও ধরব সবাই। পরশ সবুরকে মিয়াকে সাহায্য করে। সবাই মিলে কেকটা কেটে করতালিতে বসার ঘরটা আনন্দঘন হয়ে উঠে। এক আশ্চর্য আনন্দ ঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় বসার ঘরে।

টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। সবাইকে নিয়ে আরশাদ সাহেব খাবার টেবিলে এগিয়ে যায়। হরেক রকমের খাবার টেবিলে। সবুরের চোখ ছানা বড় হয়ে উঠে। এতো খাবার তো জীবনেও দেখেনি। খেতে খেতে আবার আড্ডা জমে উঠে। সবুরই আরশাদ সাহেবকে প্রশ্ন করে—

"পানিতে ডুবে ডুবে আপনাকে খোঁজার চেষ্টা করেছি। পরশকে জড়িয়ে রেখেছি অন্য হাতে, পেলাম না। তাছাড়া পরশের তো এতোক্ষণ পানিতে ডুবে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে ওকে কাঁধের উপর তুলে কোন রকমে নৌকায় ফিরে এলাম। ভাবলাম অন্তত একে তো বাঁচাতে পারলাম। আপনারা কী করলেন?"

"আর বলবেন না মমি ঢেউ এর তোড়ে প্রায় ডুবেই যাচ্ছিল। ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ডুবে ডুবে তীরে পৌছতে পারলাম। ওকে পাঁজা ঝোলে করে তীরে উঠলাম। বুঝতে পারছিলাম না কোথায় কোন জায়গায় এসে পৌঁছালাম। মমি অজ্ঞান প্রায়। বুকে চাপা দিয়ে ওর পেট থেকে কিছু পানি বের করলাম। শূন্য রাস্তার ধারে শুয়ে পড়লাম। কোথায় এলাম কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অনেক সময় কেটে গেল—বুঝতে পারছিলাম না কোথায় আমরা। অনেকক্ষণ পর ২/৩ জন ভদ্রলোক আমাদের পাশ দিয়ে যেতেই আমি হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ওরা বুঝতে পেরেছে আমরা নদী সাঁতরিয়ে এ তীরে পৌঁছেছি। বুঝতে পেরেই ওরা

আন্তরিক ভাবে বললো আপনারা সীমান্তে পৌঁছে গেছেন। আর কোন ভয় নেই। চলুন আমাদের সঙ্গে। সামনে একটা চায়ের দোকান আছে। দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়। অচেনা মানুষ। দ্বিধা কাটে না। ওরা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললো—

"ভয় নেই আপনাদের সাহায্যের জন্য আমরা হাত বাড়িয়েছি। দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও ওদের সঙ্গে চা দোকান পর্যন্ত গেলাম। মমি এতই ক্লান্ত সে ধীরে ধীরে ওকে নিতে হয়েছে। ওরা দোকানদারকে কি যেন বলল। মনে মনে ভয় গেলাম। নাহ্ হলো উল্টোটি। দোকান ঐ লোকগুলোকে নিয়ে দোকানের সামনের লম্বা বেঞ্চিটা একটু আড়ালে পেতে দিলো। সঙ্গে দিলো একটা চাদরও বালিশ। এক কাপ চা কিছু বিসকিট দিয়ে আমাকে বলল, "আপনার গিন্নীর শাড়ি তো একেবারে ভেজা। এ চাদরটা জড়িয়ে গরম চাটুকু খাইয়ে শাড়ি কিছুক্ষণ মেলে রাখলেই শুকিয়ে যাবে। আপনার ভেজা শার্টটাও মেল দিন। এ নিন আমার গেঞ্জিটা পরে গরম চা পান করুন।

উপায়ন্তর না দেখে আমি তাই করলাম। মনে মনে ভাবলাম এর নামই যুদ্ধ। যুদ্ধে অনেক বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। মমির ব্যবস্থা করে আমি গেঞ্জিটা পরে দোকানের সামনে একটা আধ ভাঙ্গা চেয়ারে বসে চায়ে চুমুকে দিলাম। অমৃতের মত মনে হলো। কিন্তু মনের দ্বিধা যায় না—কীভাবে কোন পথে আগরতলা পৌঁছাবো। লোকগুলো তখনও আমাদের সঙ্গে। ওদেরকে সীমান্তে পৌঁছার ঘটনা বলতে বলতে কেঁদে ফেললাম। পরশকে হারিয়েছি। আর সেই মাঝি? নাকি দুজনেই... ওরা আমাকে সান্ত্বনা দিলেও নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। ওরাই পথটা বাতলিয়ে দিলো কীভাবে আগরতলায় পৌঁছা যায়। ইতিমধ্যে আমার শার্ট মমির শাড়ি শুকিয়ে গেছে। শোকে কাতর মমি বেঞ্চে শুয়েই আছে। আমি জানতে চাইলাম "কীভাবে পৌঁছাবো?" একটা রিক্সা নিয়ে সামনে দুক্রোশের মত পৌঁছলে টেক্সি স্ট্যান্ড আছে। টেক্সিতেও যেতে পারেন—পাশে রেল ষ্টেশন আছে। যে কোন একটি পছন্দ করে সেখানে পৌঁছতে পারবেন। অনেক চিন্তা করে টেক্সিতে যাবো বলেই ঠিক করলাম। ঢাকা থেকে আসার সময় আমার স্ত্রী আঁচলে শক্ত গিঁট দিয়ে বেশ কিছু টাকা নিয়েছিল। টাকা গুলো আঁচলেই বাঁধা আছে। লোক গুলোর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য মমির কাছে ফিরে এলাম। মমি তখনও ডুকরে ডুকরে পরশের জন্য কাঁদছে। ছেলেকে হারিয়ে আমার ভেতরেও ঝড় বইছে। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হতেই হবে। নিজকে শক্ত করে মমিকে বললাম শাড়িটা শুকিয়ে গেছে। পরে নাও। টাকাগুলো আমার কাছে দাও। কিছু আঁচলেই বেঁধে রাখো। এসো। ওকে কোন কথার উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ফিরে অপেক্ষা মান লোকগুলোকে বললাম "টেক্সিতেই যাবো। আগরতলায় পৌঁছলে টেক্সির ভাড়ার অভাব হবে না। আমাদের কাছে টাকা আছে তা ওদের বুঝতে দেইনি। কী জানি কার মনে কী আছে।

দুটো রিক্সা নিয়ে একটায় আমি, মমি, তিন ভদ্রলোক আর এক রিক্সায়। পৌঁছে গেলাম টেক্সি স্ট্যান্ডে। ভাড়া চুকিয়ে টেক্সি নিয়ে ভদ্রলোকদের বিদায় জানিয়ে আগরতলার শরণার্থী ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম। ক্লান্ত মমির হাতটা শক্ত করে ধরে সামনে এগুতেই কত চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেশ স্বাধীন করার

প্রত্যয়ে ওরাও এসেছে। এক একজন বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে ব্যস্ত। ওরা আমাকে তথ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেল। আমার পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে করতে একজন প্রশ্ন করে—"আপনি কী রাজনীতি করেন?" নাহ্ আমি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক। দেশকে স্বাধীন করার জন্য কিছু অবদান রাখতে বসেছি। দেশ স্বাধীন করে ছাড়াবো।"

ওরা আমাকে কাজ দিলো স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে। পরশ হারিয়ে যাবার কথা বলে মমির শারীরিক অবস্থার কথা বলতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওর ভর্তির ব্যবস্থা হলো। কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রতিদিন আহত মুক্তিযোদ্ধা, মা বোন, শিশু আহত হয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসতো। ওদের সেবা করতে কী যে গর্ববোধ করতাম। কিন্তু মমির অবস্থা দিন দিন অবনতি হচ্ছিল। একেবারে মানসিক রোগী হয়ে উঠলো। শুধু বলতো পরশ বেঁচে আছে। ওকে ফিরিয়ে আনো। দিন রাত না খাওয়া না ঘুম। শুধু বিড় বিড় করে পরশের সঙ্গে কথা বলা। ওকে বোঝাবার ধৈর্য্য প্রায় হারিয়েই ফেলেছি। আমরা কোন গ্রামে কার বাড়িতে ছিলাম, কী ছিল মাঝির নাম আমি তো কিছুই জানি না।

দেশ স্বাধীন হবার পর ফিরে শুনলাম যে বন্ধু আমাদের রাতের অন্ধকারে ঢাকা থেকে নিয়ে গিয়েছিল সে এবং আরো কজন শহীদ হয়েছে। তবু নিজের বিবেকের তাড়নায় একদিন দুজনে ঢাকা ছেড়ে কুমিল্লার কয়েকটি গ্রাম খুঁজেছি। মাঝির নাম গ্রামের নাম না জানার কারণে অনেক খুঁজে ও কোন হদিস পাইনি। এ হলো সংক্ষেপে আমার মুক্তিযুদ্ধের জীবন গাঁথা। ভাগ্যিস পরশের ছবি, পারিবারিক ছবি, প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিস এক স্যুটকেসে আমার আত্মীয়ের বাসায় রেখে গিয়েছিলাম বলেই এতো কাল পরশের স্মৃতি আমাদের কাছে জীবন্তই ছিল।

আরশাদের কথাও শেষ, খাওয়ার পর্ব শেষ। আরশাদ সাহেব সবুরও পরশের হাত ধরে বসার ঘরে ফিরে আসে। সবাইকে ও ডাকে।

সবুর সাহেব আপনি আমার পরিবারের একজন হয়ে গেলেন। শুধু আপনি নন, আপনার স্ত্রী, ভাই তার স্ত্রী ভাই এর ছেলে মেয়েরাও আমার পরিবারের সদস্য আজ থেকে।

"দোস্ত আমি আর বনফুল?" আরশাদ হো হো করে হেসে বলে "তুমি যাবে কোথায়? ছোটবেলা থেকে আমরা বন্ধু। একে অপরের দুঃখ ভাগ করে নিয়েছি। আমার শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর মমি আর বনফুল দুজন বোন তোর কারণেই পরশকে ফিরে পাওয়া। আল্লাহরই হুকুম সবুর সাহেব তোমাকে কেন এতো বছরের পুরানো কষ্টের কথা বলবে। উনি তো জানেন না। তোমার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক।"

আরশাদ সাহেব অন্য কথা বলেন—"সবুর সাহেব আপনি যা করেছেন ইতিহাসে বিরল। এ ঋণ শোধের নয়। আমি ব্যাঙ্কার। অনেক ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ আছে। এ বিনিয়োগ দিয়ে আপনার জন্য কিছু করতে পারলে নিজকে ধন্য মনে করবো। এ নিয়ে পরে কথা বলব। পরশকে বুকে জড়িয়ে —মমিও বলে সমস্বরে আমাদের সংসার কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছেন। হামিদুরের ইশারায় সবুরকে বলে পরশের হাতটা আরশাদ ও মমির হাতে তুলে দিতে।

সবুর উঠে যায়। বলে—"আপনাদের বুকের মানিক ফিরে পেলেন। আমি পেলাম বড় সংসার। আমিও যেন পরশের পাশে থাকতে পারি। পরশ বাবাজি আমিও আছি তোর পাশে। পরশ তিনজনকে জড়িয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে।